

E-BOOK

মতিচূর

(প্রথম খণ্ড)

মিসেস্ আর. এস. হোসেন
(রোকেয়া সখাওয়াত হোসেন)



মতিচূর

(প্রথম খণ্ড)

মিসেস্ আর. এস. হোসেন
(রোকেয়া সখাওয়াত হোসেন)



রোকেয়া সখাওয়াত হোসেন

মতিচূর প্রথম খণ্ড

মিসিস্ আর, এস্, হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯০৪

মিসিস্ আর, এস্, হোসেন বা মিসেস্ আর, এস্, হোসেন কর্তৃক প্রণীত বইগুলো বাংলা একাডেমী 'রোকেয়া রচনাবলী' নামের সংকলনে বেগম রোকেয়া'র রচনা বলে প্রকাশিত হয়। ২০০৬ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নতুন সংস্করণের ভূমিকা'য় (ভূমিকার রচয়িতা ও তারিখ অনুল্লেখিত) বলা আছে, "বেগম রোকেয়া বা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নামে যিনি বহুলপরিচিত, তিনি লিখতেন 'মিসেস আর. এস. হোসেন' নামে, এই নামে তাঁর বইগুলিও বেরিয়েছিল।"

তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলিম ও হিন্দু সমাজ, পারিবারিক জীবনে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, সমাজ জীবনে পরস্পরের সাপেক্ষে নারী ও পুরুষের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ সম্মৃদ্ধ প্রবন্ধ সংকলন মতিচূর। মতিচূর দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

সূচিপত্র

নিবেদন

মতিচূরের কোন কোন পাঠকের সমালোচনায় জানা যায় যে তাঁহারা মনে করেন, মতিচূরের ভাব ও ভাষা অন্যান্য খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন পুস্তকের সহিত মতিচূরের সাদৃশ্য দর্শনে পাঠকদের ওরূপ প্রতীতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অপরের ভাব কিম্বা ভাষা স্বায়ত্ত করিতে যে সাহস ও নিপুণতার প্রয়োজন, তাহা আমার নাই; সুতরাং তাদৃশ্য চেষ্টা আমার পক্ষে অসম্ভব। (কালীপ্রসন্নবাবুর "ভ্রান্তিবিনোদ" আমি অদ্যাপি দেখি নাই এবং বঙ্কিমবাবুর সমুদয় গ্রন্থ পাঠের সুযোগও প্রাপ্ত হই নাই। যদি অপর কোন গ্রন্থের সহি মতিচূরের সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ দৈব ঘটনা।)

আমিও কোন উর্দ্দু মাসিক পত্রিকায় কতিপয় প্রবন্ধ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি-উক্ত প্রবন্ধাবলীর অনেক অংশ মতিচূরের অবিকল অনুবাদ বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে প্রবন্ধসমূহের লেখিকাগণ বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞা।

ইংরাজ মহিলা মেরী করেলীর "ডেলিশিয়া হত্যা" (The murder of Delicia) উপন্যাস খানি মতিচূর রচনার পূর্বে আমার দৃষ্টিগোচর হই নাই, অথচ অংশবিশেষের ভাবের সহিত মতিচূরের ভাবের ঐক্য দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কেন এরূপ হয়? বঙ্গদেশ, পঞ্জাব, ডেকান (হায়দরাবাদ), বোম্বাই, ইংলন্ড-সর্বত্র হইতে একই ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, ইহার কারণ সম্ভবতঃ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অবলাবৃন্দের আধ্যাত্মিক একতা!

কতিপয় সহৃদয় পাঠক মতিচূরে লিখিত ইংরাজী শব্দ ও পদের বাঙ্গালা অর্থ না লেখার ত্রুটী প্রদর্শন করিয়াছেন। এবার যথাসম্ভব ইংরাজী শব্দসমূহের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল। যাঁহারা মতিচূরে যে কোন ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

মতিচূরে আর যে সকল ত্রুটী আছে, তাহার কারল লেখিকার বিদ্যা-বুদ্ধির দৈন্য এবং বহুদর্শিতার অভাব। গুণগ্রাহী পাঠক পাঠিকাগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী।

কা'ল বলেছিলে প্রিয়! আমারে বিদায়
দিবে, কিন্তু নিলে আজ আপনি বিদায়!

*

দুঃখ শুধু এই-ছেড়ে গেলে অভাগায়
ডুবাইয়া চির তরে চির পিপাসায়!
যখন যেদিকে চাই,   কেবলি দেখিতে পাই,--
"পিপাসা, পিপাসা" লেখা জ্বলন্ত ভাষায়।
শ্রবণে কে যে ঐ "পিপাসা" বাজায়।

প্রাণটা সত্যই নিদারুণ তৃষানলে জ্বলিতেছে। এ জ্বালার শেষ নাই, বিরাম নাই, এ জ্বালা অনন্ত। এ তাপদগ্ধ প্রাণ যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকে নিজের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। পোড়া চক্ষে আর কিছুই দেখি না। পুস্পময়ী শস্যশ্যামলা ধরণীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি আমি দেখি না। বিশ্ব জগতের মনোরম সৌন্দর্য আমি দেখি না। আমি কি দেখি, শুনিবে? যদি হৃদয়ে ফটোগ্রাফ্ তোলা যাইত, যদি চিত্রকরের তুলিতে হৃদয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার শক্তি থাকিত,-তবে দেখাইতে পারিতাম, এ হৃদয় কেমন! কিন্তু সে উপায় নাই।

ঐ যে মহরমের নিশান, তাজিয়া প্রভৃতি দেখা যায়,-ঢাক ঢোল বাজে, লোকে ছুটাছুটি করে, ইহাই কি মহরম? ইহাতে কেবল খেলা, চর্ম্মচক্ষে দেখিবার তামাসা। ইহাকে কে বলে মহরম? মহরম তবে কি? কি জানি, ঠিক উত্তর দিতে পারিলাম না। কথাটা ভাবিতেই পারি না,-ওকথা মনে উদয় হইলেই আমি কেমন হইয়া যাই,-চক্ষে অন্ধকার দেখি, মাথা ঘুরিতে থাকে! সুতরাং বলিতে পারি না-মহরম কি!

আচ্ছা তাহাই হউক, ঐ নিশান তাজিয়া লইয়া খেলাই হউক; কিন্তু ঐ দৃশ্য কি একটা পুরাতন শোকস্মৃতি জাগাইয়া দেয় না? বায়ু-হিল্লোলে নিশানের

কাপড় আন্দোলিত হইলে, তাহাতে কি স্পষ্ট লেখা দেখা যায় না-"পিপাসা"? উহাতে কি একটা হৃদয়-বিদারক শোকস্মৃতি জাগিয়া উঠে না? সকল মানুষই মরে বটে-কিন্তু এমন মরণ কাহার হয়[১]?

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম-স্বপ্নে মাত্র যেন সেই কারবালায় গিয়াছি। ভীষণ মরুভূমি তপ্ত বালুকা; চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে; সমীরণ হায় হায় বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে! আমি কেবল শুনিতে পাইলাম-"পিপাসা, পিপাসা"! বালুকা কণায় অঙ্কিত যেন "পিপাসা, পিপাসা"! চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলাম, সব শূন্য, তাহার ভিতর "পিপাসা" মূর্ত্তিমতী হইয়া ভাসিতেছে!

সে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর-তথা হইতে দূরে চলিলাম। এখানে যাহা দেখিলাম, তাহা আরও ভীষণ, আরও হৃদয়-বিদারক! দেখিলাম-মরুভূমি শোণিত-রঞ্জিত[২]! রক্ত-প্রবাহ বহিতে পারে নাই-যেমন রক্তপাত হইয়াছে, অমনি

---

[১] একদা জয়নাল আবেদীন (হোসেনের পুত্র) জনৈক কসাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাগল জবেহ করিতে আনিয়াছ, উহাকে কিছু খাইয়াইয়াছ?" কসাই উত্তর করিল, "হ্যাঁ, ইহাকে এখনই প্রচুর জলপান করাইয়া আনিলাম!" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলে, "তুমি ছাগলটাকে প্রচুর জলপানে তৃপ্ত করিয়া জবেহ করিতে আনিয়াছ; আর শিমর আমার পিতাকে তিন দিন পর্যন্ত জলাভাবে পিপাসায় দগ্ধ করিয়া জবেহ করিয়াছে!!"

কারবালার যুদ্ধের সময় জয়নাল ভুগিতেছিলেন বলিয়া শহীদ (সমরশায়ী) হয় নাই।

[২] ধর্ম্মগুরু মহাত্মা মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পর, ক্রমান্বয়ে আবুবকর সিদ্দিক, ওমর খেতাব ও ওসমান গনি "খলিফা" হইলেন। চতুর্থবারে আলী খলিফা হইবেন, কি মোয়াবীয়া খলিফা হইবেন, এই বিষয়ে মতভেদ হয়। একদল বলিল, "মোয়াবীয়া হইবেন," একদল বলে "আলী মোহাম্মদের (দঃ) জামাতা, তিনি সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী"। এইরূপে বিবাদের সূত্রপাত হয়।

অতঃপর মোয়াবীয়ার পুত্র এজিদ, আলীর পুত্র হাসান ও হোসেনের সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। এজিদ মহাত্মা হাসানকে কৌশলে বিষ পান করাইয়া হত্যা করে। ইহার এক বৎসর পরে মহাত্মা হোসেনকে ডাকিয়া (নিয়ন্ত্রণ করিয়া) কারবালায় লইয়া গিয়া যুদ্ধে বধ করে। কেবল যুদ্ধ নহে-এজিদের দলবল ইউফ্রেতীজ নদী ঘিরিয়া রহিল; হোসেনের পরে কোন লোককে

নদীর জল লইতে দেয় নাই। পানীয় জলের অভাবেই তাঁহারা আধমরা হইয়াছিলেন। পরে যুদ্ধের নামে একই দিন হোসেন আত্মীয়স্বজনসহ নিহত হইলেন। এ কথায় মতভেদ আছে; কেহ বলেন, তিন দিন যুদ্ধ হয়, কেহ বলেন একই দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে সমরশায়ী হইয়াছেন। নদীর জল হইতে হোসেনকে বঞ্চিত করিয়া এজিদ অশেষ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছে।

অষ্টাদশ বর্ষীয় নবীন যুবক কাসেম (হাসানের পুত্র) মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে হোসেনের কন্যা সকিনাকে বিবাহ করেন! কারবালা যখন সকিনাকে নববধূ বেশে দেখিল, তাহার কয় ঘন্টা পরেই তাঁহাকে নববিধবা বেশে দেখিয়াছিল! যেদিন বিবাহ, সেই দিনই বৈধব্য! হায় কারবালা! এ দৃশ্য দেখার চেয়ে অন্ধ কেন হও নাই? পুরুষগণ ত যুদ্ধ করিতেছিলেন, আর ললনাগণ কি পাইলেন!-কাসেমের জন্য কাঁদিতেছিলেন, আলী আকবরের মৃতদেহ পাইলেন! শোকোচ্ছ্বাস কাসেমকে ছাড়িয়া আকবরের দিকে ধাবিত হইল,-আকবরের মাথা কোলে লইয়া কাঁদিতেছিলেন, শিশু আসগরকে শর-বিদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন! এক মাতৃ-হৃদয়-আকবরকে কোল হইতে নামাইয়া আসগরকে কোলে লইল-কত সহ্য হয়? পুত্রশোকে আকুল্য আছেন,-কিছুক্ষণ পরে সর্বস্বধন হোসেনের ছিন্ন মস্তক (শত্রু উপহার পাঠাইল) পাইলেন, তাই দেখিতেছেন, ইতোমধ্যে (হোসেনের কন্যা) বালিকা ফাতেমা পিতার মাথা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, শহরবানু তাহার জন্য সান্তনার উপায় খুঁজিতেই ছিলেন-ফাতেমার শ্বাসরোধ হইল! ক্ষুধায় পিপাসায় কাতরা বালিকা কত সহিবে? হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল! শহরবানু এখন সকিনার অশ্রু মুছাইবেন, না ফাতেমাকে কোলে লইবেন?

আহা! এত যে কেহই সহিতে পারিবে না! আমার শোকসন্তপ্তা পুত্র-শোকাতুরা ভগিনীগণ তোমরা একবার শহরবানু ও জয়নবের শোকরাশির দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমরা একজনের শোকেই বিহবল হও-দশদিক অন্ধকার দেখ! আর এ যে শোকসমূহ! আঘাতের উপর আঘাত। তোমরা এক সময় এক জনের বিরহে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পার, তাঁহাদের সে অবসর ছিল না! এক জয়নব কি করিবেন বল, নিজের পুত্রের জন্য কাঁদিবেন, না প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্রদের দিকে চাহিবেন, না সব ছাড়িয়া ভ্রাতা হোসেনের ক্ষত ললাটখানি অশ্রুধারায় ধুইবেন? সেখানে অশ্রু ব্যতীত আর জল ত ছিল না!

বীরহৃদয়! একবার হোসেনের বীরতা সহিষ্ণুতা দেখ! ঐ দেখ, তিনি নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া-আর কোন যোদ্ধা নাই, সকলে সমরশায়ী, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একা। তিনি কোন মতে পথ পরিস্ড়্কার করিয়া নদী পর্যন্ত গিয়াছেন। ঐ দেখ অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিলেন, বুঝি পান করেন; না, পান ত করিলেন না!-যে জলের জন্য আসগর তাঁহারই কোলে প্রাণ হারাইয়াছে, আকবর তাঁহার রসনা পর্যন্ত চুষিয়াছেন-সেই জল তিনি পান করিবেন? না,-তিনি জল তুলিয়া দেখিলেন, ইচ্ছা করিলে পান করিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া নদীর জল নদীতেই নিক্ষেপ করিলেন! বীরের উপযুক্ত কাজ!!

*

পিপাসু মরুভূমি তাহা শুষিয়া লইয়াছে! সেই রুধির-রেখায় লেখা-"পিপাসা, পিপাসা"!

নবীন যুবক আলী আকবর (হোসেনের পুত্র) যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পিতার নিকট পিপাসা জানাইতে আসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন-"আল-আৎশ! আল-আৎশ!!" (পিপাসা, পিপাসা!) ঐ দেখ, মহাত্মা হোসেন স্বীয় রসনা পুত্রকে চুষিতে দিলেন, যদি ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হয়! কিন্তু তৃপ্তি হইবে কি,-সে রসনা যে শুষ্ক-নিতান্ত শুষ্ক! যেন দিক দিগন্তর হইতে শব্দ আসিল,-"পিপাসা পিপাসা"!

মহাত্মা হোসেন শিশুপুত্র আলী আসগরকে কোলে লইয়া জল প্রার্থনা করিতেছেন! তাঁহার কথা কে শুনে? তিনি দীন নয়নে আকাশপানে চাহিলেন,-আকাশ মেঘশূন্য নির্ম্মল,-নিতান্তই নির্ম্মল! তিনি নিজের কষ্ট,-জল পিপাসা অম্লান বদনে সহিতেছেন। পরিজনকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়াছেন। সকিনা প্রভৃতি বালিকারা জল চাহে না-তাহারা বুঝে, জল দুস্প্রাপ্য। কিন্তু আসগর

মহরমের সময় সুন্নি-সম্প্রদায় শিয়াদলে আমোদের জন্য যোগ দেয় না। এ কথা যে বলে, তাহার ভুল,-শোচনীয় ভুল। আলী ও তদীয় বংশধরগণ উভয় সম্প্রদায়েরই মান্য ও আদরণীয়। তাঁহাদের শোচনীয় মৃত্যু স্মরণ সময়ে কোন প্রাণে সুন্নিগণ আমোদ করিবে? আমোদ করে বালকদল, সহৃদয় সুন্নিদল মহরমকে উৎসব বলে না।

শিয়াদের বাহ্য আড়ম্বর সুন্নিগণ ভাল মনে করেন না। বক্ষে করাঘাত করিলে বা শোক-বস্ত্র পরিধান করিলেই যে শোক করা হইল, সুন্নিদের এরূপ বিশ্বাস নহে। মতভেদের কথা এই যে, শিয়াগণ হজরতা আয়ষা-ফাতেমার বিমাতা সিংহাসন আলীকে না দিয়া মোয়াবীয়াকে দিয়াছেন বলিয়া আয়ষাকে নিন্দা করে। আমরা আয়ষার (আলীর সৎশাশুড়ী হওয়া ব্যতীত আর) কোন দোষ দেখি না। চতুর্থ খলিফা কে হইবেন, ধর্ম্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার নাম স্পষ্ট না বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। সে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি মোয়াবীয়া কিম্বা আলী তাঁহারা উভয়ে একই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাই মতভেদ হইল। কেহ বলিল "চতুর্থ খলিফা মোয়াবীয়া," কেহ বলিল "আলী"।
আয়ষা হিংসা করিয়া বলেন নাই, সিংহাসন মোয়াবীয়া পাইবেন। তিনি ঐ অনুমানের কথাই বলিয়াছিলেন মাত্র। সুন্নিগণ মাননীয়া আয়ষার নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। শিয়া সুন্নিতে এইটুকু কথার মতভেদ। এই বিষয় লইয়াই দলাদলি।

বুঝে না-সে দুগ্ধপোষ্য শিশু, নিতান্ত অজ্ঞান। অনাহারে জলাভাবে মাতার স্তন্য শুকাইয়া গিয়াছে-শিশু পিপাসায় কাতর।

শহরবানু (হোসেনের স্ত্রী) অনেক যন্ত্রণা নীরবে সহিয়াছেন-আজ আসগরের যাতনা তাঁহার অসহ্য! তিনি অনেক বিনয় করিয়া হোসেনের কোলে শিশুকে দিয়া জল পার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন,-“আর কেহ জল চাহে না; কেবল এই শিশুকে একটু জল পান করাইয়া আন। শত্রু যেন ইহাকে নিজ হাতে জল পান করায়,-জলপাত্রটা যেন তোমার হাতে নাই দেয়!!”

মহাত্মা হোসেন স্ত্রীর কাতরতা এবং শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া জল প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাতরস্বরে বলিলেন, “আমি বিদেশী পথিক, তোমাদের অতিথি, আমার প্রতি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর, সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ শিশু তোমাদের নিকট কোন দোষে দোষী নহে। পিপাসায় ইহার প্রাণ ওষ্ঠাগত-একবিন্দু জল দাও! ইহাতে তোমাদের দয়াধর্ম্মের কিছুমাত্র অপব্যয় হইবে না!” শত্রুগণ কহিল, “বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে,-শীঘ্র কিছু দিয়া বিদায় কর।”

বিপক্ষ হইতে শিশুর প্রতি জলের পরিবর্ত্তে তীর বৃষ্টি হইল!!

“পিয়াস লাগিয়া জলদে সাধিনু
বজর পড়িয়া গেল।”

উপযুক্ত অতিথি-অভ্যর্থনা বটে! হোসেন শর-বিদ্ধ আসগরকে তাহার জননীর কোলে দিয়া বলিলেন, “আসগর চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হইয়াছে! আর জল জল বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইবে না! আর বলিবে না-‘পিপাসা, পিপাসা’! এই শেষ!”

*

শহরবানু কি দেখিতেছেন? কোলে পিপাসু শর-বিদ্ধ আসগর, সম্মুখে রুধিরাক্ত কলেবর "শহীদ" (সমরশায়ী) আকবর! অমন চাঁদ কোলে লইয়া ধরণী গরবিণী হইয়াছিল-যে আকবর ক্ষতবিক্ষত হইয়া, পিপাসায় কাতর হইয়া মৃত্যুকালে এক বিন্দু জল পায় নাই। শোণিত-ধারায় যেন লেখা আছে "পিপাসা, পিপাসা"! শহীদের মুদ্রিত নয়ন দুটি নীরবেই বলে যেন "পিপাসা, পিপাসা"!! দৃশ্য ত এইরূপ মর্ম্মভেদী তাহাতে আবার দর্শক জননী!-আহা!!

যে ফুল ফুটিত প্রাতে,-নিশীথেই ছিন্ন হ'ল,
শিশিরের পরিবর্ত্তে রুধিরে আপ্লুত হ'ল!

আরও দেখিলাম,-মহাত্মা হোসেন সমরশায়ী। সমরক্ষেত্রে কেবলই পিপাসী শহীদগণ পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের শুষ্ক কণ্ঠ যেন অস্ফুট ভাষায় বলিতেছে "পিপাসা, পিপাসা"! জয়নব (হোসেনর ভগিনী) মুক্ত কেশে পাগলিনী প্রায় ভ্রাতার নিকট বিদায় চাহিতেছেন। ডাকিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতেছেন,-"ভাই! তোমাকে মরুভূমে ফেলিয়া যাইতেছি! আসিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে,-যাইতেছি তোমাকে ছাড়িয়া! আসিয়াছিলাম অনেক রত্নে বিভূষিত হইয়া-যাইতেছি শূন্য হৃদয়ে! তবে এখন শেষ বিদায় দাও! একটি কথা কও, তবে যাই! একটিবার চক্ষু মেলিয়া দেখ-আমাদের দুরবস্থা দেখ, তবে যাই!" জয়নবের দুঃখে সমীরণ হায় হায় বলিল,-দূর দূরান্তরে ঐ হায় হায় শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল!

*

এখন আর স্বপ্ন নাই-আমি জাগিয়া উঠিয়াছি। দূরে শৃগালের কর্কশ শব্দে শুনিলাম-"পিপাসা, পিপাসা"! একি, আমি পাগল হইলাম নাকি? কেবল "পিপাসা" দেখি কেন। কেবল "পিপাসা" শুনি কেন?

আমার প্রিয়তমের সমাধিস্থানে যাইলাম। বনপথ দিয়া যাইতে শুনিলাম, তরুলতা বলে "পিপাসা, পিপাসা"! পুত্রে মর্ম্মর শব্দে শুনিলাম "পিপাসা, পিপাসা"! প্রিয়তমের গোর হইতে শব্দ আসিতেছিল-"পিপাসা, পিপাসা"!

ইহা অতি অসহ্য! প্রিয়তম মৃত্যুকালে জল পায় নাই-চিকিৎসরে নিষেধ ছিল। সুতরাং পিপাসী মরিয়াছে।

আহা! এমন ডাক্তারী কে রচনা করিয়াছেন? রোগীর প্রতি (রোগ বিশেষে) জল-নিষেধ ব্যবস্থা কোন হৃদয়হীন পাষাণের বিধান? যখন রোগীকে বাঁচাইতে না পার, তখন প্রাণ ভরিয়া পিপাসা মিটাইয়া জল পান করিতে দিও। সে সময় ডাক্তারের উপদেশ শুনিও না। নচেৎ আমারই মত আজীবন পিপাসায় দগ্ধ হইবে।

কোন রোগী মৃত্যুর পূর্বদিন বলিয়াছিল, "বাবাজ্বান! তোমারই সোরাহির জল অবশ্যই শীতল হইবে। পিতা তাহার আসন্নকাল জানিয়া স্বহস্তে সোরাহি আনিয়া দিলেন। অন্যান্য মিত্ররূপী শত্রুগণ তাহাকে প্রচুর জল সাধ মিটাইয়া পান করিতে দেয় নাই। ঐ রোগীর আত্মা কি আজ পর্যন্ত কারবালার শহীদদের মত "পিপাসা, পিপাসা" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না? না; স্বর্গসুখে পিপাসা নাই! পিপাসা-যে বাঁচিয়া থাকে,-তাহারই! অনন্ত শান্তি নিদ্রায় যে নিদ্রিত হইয়াছে, পিপাসা তাহার নহে! পিপাসা-যে পোড়া স্মৃতি লইয়া জাগিয়া থাকে,-তাহারই!!

কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি,-আমার হৃদয়ানন্দ মৃত্যুর পূর্বদিন গোপনে জননীর নিকট জল চাহিয়াছিল। ডাক্তারের নিষেধ ছিল বলিয়া কেহ তাহাকে জল দিত না। জননী ভয়ে ভয়ে অল্প জল দিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে সে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ও অধীর হইয়াছিল-হায়! না জানি সে কেমন পিপাসা!

হৃদয়ানন্দ জানিত, আমি তাহাকে জল দিব না। আমি চিকিৎসকের অন্ধ আজ্ঞাবহ দাস, তাহাকে জল দিব না। তাই সে আমার উপস্থিত থাকা সময় জল চাহিতে সাহস করে নাই! কি মহতী সহিষ্ণুতা! জলের পরিবর্তে চা চাহিল। শীতল জলের পিপাসায় গরম চা!! চা তখনই প্রস্তুত হইয়া আসিল। যে ব্যক্তি চা পান করাইতেছিল, সে চার পেয়ালার কড়া ধরিতে পারিতেছিল না-পেয়ালা এত তপ্ত ছিল। আর সেই পিপাসী সে পেয়ালাটি দুই হস্তে (যেন কত আদরের সহিত জড়াইয়া) ধরিয়া চা পান করিতে লাগিল!! আহা! না জানি সে কেমন পিপাসা!! অনলরচিত পিপাসা!! কিম্বা গরলরচিত পিপাসা!!

সে সময় হয় ত তাহার শরীরে অনুভব শক্তি ছিল না,-নচেৎ অত গরম পেয়ালা ও কোমল হস্তে সহিবে কেন? আট বৎসরের শিশু-ননীর পুতুল, তাহার হাতে গরম পেয়ালা!-আর সেই তপ্ত চা-স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে নিশ্চয় গলায় ফোস্কা হইত! আর ঐ মাখন-গঠিত কচি হাত দুটি জ্বলিয়া গলিয়া যাইত!! সেই চা তাহার শেষ পথ্য-আর কিছু খায় নাই।

আক্ষেপ এই যে, জল কেন দিলাম না। রোগ সারিবার আশায় জল দিতাম না।- রোগ যদি না সারিল, তবে জল কেন দিলাম না? এই জন্যই ত রাত্রি দিন শুনি,-"পিপাসা, পিপাসা"! ঐ জন্যই ত এ নরকযন্ত্রণা ভোগ করি। আর সেই গরম চা'র পেয়ালা চরে সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়ে আঘাত করে, প্রাণ দগ্ধ করে! চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেখি-অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময় অরে লেখা-"পিপাসা, পিপাসা"!

নিশীথ সময়ে গৃহছাদে উঠিলাম। আকাশমণ্ডল পরিস্আরর ছিল কোটী কোটী তারকা ও চন্দ্র হীরক প্রভায় জ্বলিতেছিল। আমার পোড়া চক্ষে দেখিলাম-ঐ তারকা-অরে লেখা-"পিপাসা, পিপাসা"! আমি নিজের পিপাসা লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে আবার বিশ্বচরাচর পিপাসা দেখায়-পিপাসা শুনায়! বোধ হয় নিজের পিপাসার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই মাত্র,-আর কেহ পিপাসী নহে। অথবা এ বিশ্বজগৎ সত্যিই পিপাসু!

কুসুমকাননে আমি কি দেখিতে পাই? কুসুম হেলিয়া দুলিয়া বলে "পিপাসা, পিপাসা" লতায় পাতায় লেখা-"পিপাসা, পিপাসা"। কুসুমের মনোমোহিনী মৃদু হাসি আমি দেখি না। আমি দেখি, কুমুদের সুধাংশু-পিপাসা।

বিহগ-কুজনে আমি কি শুনিতে পাই? ঐ "পিপাসা, পিপাসা"! ঐ একই শব্দ নানাসুরে নানারাগে শুনি,-প্রভাতে ভৈরবী, নিশীথে বেহাগ-কিন্তু কথা একই। চাতক পিপাসায় কাতর হইয়া ডাকে-"ফটিক জল"! কোকিল ডাকিয়া উঠে "কুহু" ঐ কুহুস্বরে শত প্রাণের বেদনা ও হৃদয়ের পিপাসা ঝরে! এ কি, সকলে আমাকে পিপাসার ভাষা শুনায় কেন? আহা! আমি কোথাই যাই? কোথায় যাইরে "পিপাসা" শুনিব না?

চল হৃদয়, তবে নদী তীরে যাই,-সেইখানে হয় ত "পিপাসা" নাই। কিন্তু ঐ শুন! স্নিগ্ধসলিলা গঙ্গা কুলকুল স্বরে গাহিতেছে। "পিপাসা, পিপাসা" আপন মনে গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে! একি তুমি স্বয়ং জল, তোমার আবার পিপাসা কেমন? উত্তর পাইলাম, "সাগর-পিপাসা"। আহা! তাই ত, সংসারে তবে সকলেই পিপাসু? হইতে পারে, সাগরের-যাহার চরণে, জাহ্নবি! তুমি আপনার প্রাণ ঢালিতে যাইতেছ, তাহার পিপাসা নাই। তবে দেখা যাউক।

একদিন সিন্ধু'তটে সিক্ত বালুকার উপর বসিয়া সাগরের তরঙ্গ গণনা করিতেছিলাম। ঊর্ম্মিমালা কি যেন যাতনায়, কি যেন বেদনায় ছটফট করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল। এ অস্থিরতা, এ আকুলতা কিসের জন্য? সবিস্ময়ে সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ

তব এই সচঞ্চল লহরীমালায়
কিসের বেদনা লেখা?-পিপাসা জানায়!
পিপাসা নিবৃত্ হয় সলিল-কৃপায়,
বল হে জলধি! তব পিপাসা কোথায়?

আবার তাহার গভীর গর্জ্জনে শুনিলাম, "পিপাসা, পিপাসা"! হায়! এই পোড়া পিপাসায় জ্বালায় আমি দেশান্তরে পলাইয়া আসিলাম, এখানেও ঐ নিষ্ঠুর কথাই শুনিতে পাই। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম-ঐ তরঙ্গে তরঙ্গে আর পিপাসা দেখিতে ইচ্ছা ছিল না। সমুদ্র আবার গম্ভীর গর্জ্জন করিল। এবারও তাহার ভাষা বুঝিলাম,-স্পষ্ট শুনিলাম,-"পিপাসা, পিপাসা।"!!

"পিপাসা পিপাসা"-মুর্খ মানব! জান না এ কিসের পিপাসা? কোথায় শুনিয়াছ সাগরের পিপাসা নাই? এ হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত পিপাসা কেমন করিয়া দেখাইব? আমার হৃদয় যত গভীর, পিপাসাও তত প্রবল! এ সংসারে কাহার পিপাসা নাই? পিপাসা পিপাসা-এইটুকু বুঝিতে পার না? ধনীর ধন-পিপাসা, মানীর মান-পিপাসা, সংসারীর সংসার-পিপাসা। নলিনীর তপন-পিপাসা, চকোরীর চন্দ্রিকা-পিপাসা! অনলেরও তীব্র পিপাসা আছে! আহা! এই মোটা কথা বুঝ না? পিপাসা না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিত কি লক্ষ্য করিয়া? আমার

হৃদয়ে অনন্ত প্রণয়-পিপাসা,-যতদিন আছি, পিপাসাও থাকিবে! প্রেমিকের প্রেম-পিপাসা,-প্রকৃতির ঈশ্বর পিপাসা! এইটুকু কি বুঝিতে পার না?....”

তাই বটে, এত দিনে বুঝিলাম, আমার হৃদয়ে কেন সদা হু হু করে, কেন সদা কাতর হয়। এ হৃদয়ের পিপাসা তুচ্ছ বারি পিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম-পিপাসা। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকলে পিপাসী-ঐ বাঞ্ছনীয় প্রেমময়ের প্রেম-পিপাসী!!

আমি তবে বাতুল নহি। আমি যে পিপাসা দেখি, তাহা সত্য-কল্পিত নহে! আমি যে পিপাসা শুনি, তাহাও সত্য-কল্পনা নহে! ঈশ্বর প্রেম, এ বিশ্বজগৎ প্রেম-পিপাসু।

পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? না। আমরা দাসী কেন?[৩]-কারণ আছে।

আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানাবিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্ম্মিনী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবতঃ সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অম ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষ পক্ষ হইতে যতই বেশী সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছেন, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা বাড়িতেছে! ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বোধ করে না।

---

[৩] কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত-তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত নারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এস্থলে আমরা ধর্মগ্রন্থের কোন মতামত লইয়া আলোচনা করিব না-কেবল সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিব। অর্থাৎ স্বকীয় মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের,-প্রকারান্তরে পুরুষের-দাসী হইয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহু কাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বারবার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেনঃ

"The five worst maladies that afflict the female mind are: indocility, discontent, slander, jealousy and silliness ... such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and to obey her husband." (Japan, the Land of the Rising Sun)

(ভাবার্থ-স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই-(কোন বিষয় শিক্ষার) অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মুর্খতা। ...নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে)।

তারপর কেহ বলেন "অতিরঞ্জন ও মিথ্যা বচর রমণী-জিহবার অলঙ্কার!" আমাদিগকে কেহ "নাকেস-উল-আকেল" এবং কেহ "যুক্তিজ্ঞানহীন" (unreasonable) বলিয়া থাকেন। আমাদের ঐ সকল দোষ আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দেখুন। এদেশে জামাতা খুব আদরণীয়-এমনকি ডাইনীও জামাই ভালবাসে। তবু "ঘরজামাইয়ের" সেরূপ আদর হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী,

গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে ক্রমে আমাদের “স্বামী” হইয়া উঠিলেন[8]! আর আমরা ক্রমশঃ তাঁহাদের গৃহপালিত পশু পীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি!

---

[8] “Although the Japanese wife is considered only the first serveant of her husband, she is usually addressed in the house as the honorable mistress” “acquaintance with European customes has awakened among the more educated classes in Japan a desire to raise the position of women.” (Japan.)
ভাবার্থ-(যদিও জাপানে স্ত্রীকে স্বামীর প্রধানা সেবিকা মনে করা হয় কিন্তু সচরাচর তাহাকে গৃহস্থিত অপর সকলে মাননীয়া গৃহিণী বলিয়া ডাকে। যাহা হউক আশা ও সুখের বিষয় এই যে এখন ইউরোপীয় রীতি নীতির সহিত পরিচিত শিতি সমাজে ক্রমশঃ রমণীর অবস্থা উন্নত করিবার আকাঙ্খা জাগ্রত হইতেছে।

“দাসী” শব্দে অনেক শ্রীমতী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, “স্বামী” শব্দের অর্থ কি? দানকর্ত্তাকে “দাতা” বলিলে যেমন গ্রহণ কর্ত্তাকে “গ্রহীতা” বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে “স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর” বলিলে অপরকে “দাসী” না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন? যদি বলেন স্ত্রী পতি-প্রেম-পাশে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সেবিকা হইয়াছেন, তবে ওরূপ সেবাব্রত গ্রহণে অবশ্য কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষও কি ঐরূপ পারিবারিক প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতিপালনরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই? দরিদ্রতম মজুরটিও সমস্ত দিন অনশনে পরিশ্রম করিয়া সন্ধান দুই এক আনা পয়সা পারিশ্রমিক পাইলে বাজারে গিয়া প্রথমে নিজের উদর-সেবার জন্য দুই পয়সার মুড়ি মুড়কীর শ্রাদ্ধ করে না। বরং তদ্দারা চাউল চাউল কিনিয়া পত্নীকে আনিয়া দেয়। পত্নীটি রন্ধনের পর “স্বামী” কে যে “একমুঠা” অন্নদান করে, পতি বেচারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। কি চমৎকার আত্মত্যাগ! সমাজ তবু বিবাহিত পুরুষকে “প্রেম-দাস” না বলিয়া স্বামী বলে কেন? হাঁ, আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িল; যে সকল দেবী স্ত্রীকে “দাসী” বলায় আপত্তি করেন এবং কথায় কথায় সীতা সাবিত্রীর দোহাই দেন তাঁহারা কি জানেন না যে, হিন্দুসমাজেই এমন এক (বা ততোধিক) শ্রেণীর কুলীন আছেন, যাঁহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন? যাহাকে অর্থ দ্বারা “ক্রয়” করা হয়, তাহাকে “ক্রীতদাসী” ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? এস্থলে বরদিগের পাশবিক্রয়ের কথা কেহ উল্লেখ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণে “বর বিক্রয় হয়” এরূপ বলেন না। বিশেষতঃ বরের পাশই বিক্রয় হয়, স্বয়ং বর বিক্রীত হন না। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের কথায় এ যুক্তি খাটে না; কারণ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার এমন বিশেষ কোন গুণ বা “পাশ” থাকে না, যাহা বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং বালিকা স্বয়ং বিক্রীতা হয় !! একদা কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাণীর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে ঐ কথা উঠায়, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “কেন ওঁদের সমক কুলীন কি পাওয়া যায় না যে মেয়ে কিনতে হয়?” তদুত্তরে মহিলাটি

সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের সৃষ্টি হইলে পর সামাজিক নিয়মগুলি অবশ্য সমাজপতিদের মনোমত হইল! ইহাও স্বাভাবিক। "জোর যার মুলুক তা"। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অবনতির জন্য কে দোষী?

আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি-এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলংকার দাসত্বের নিদর্শন[৫] (originally badges of slavery) ছিল। তাই দেখা যায় কারগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্ম্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিষ হাতকড়ী স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্ম্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না! কুকুরের গলে যে গলাবদ্ধ (dogcollar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্ম্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি "হার পরিয়াছি"। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ী" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে "স্বামী"র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনি! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আবার মজা দেখুন, তাঁহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যা গণ্যা!

বলিয়াছিলেন, "পাওয়া যাবে না কেন? ওদের ঐ কেনা ব্যাচাই নিয়ম। এ যেমন ওর বোন কিনে বিয়ে ক'রলে, আবার এর বোনকে আর একজনে কিনে বিয়ে ক'রবে।"

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম বা বিশেষ কোন দোষের উল্লেখ করিবার আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কুতার্কিকদিগের কুতর্ক নিবারণের নিমিত্ত এইরূপ ক্রীতদাসী ওরফে দেবীর প্রমাণ দিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য আমরা নিজেই দুঃখিত। কিন্তু কর্ত্তব্য অবশ্যপালনীয়।

[৫] পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক শম্‌স্‌-উল-উলামা (জাকউল্লা সাহেব) বলেন "নথ নাকেল্‌ (নাকদড়ীর) ই রূপান্তর!"

এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে! তাই দরিদ্রা! কামিনীগণ স্বর্ণরোপ্যের হাতকড়ী না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীন সার্থক করে। যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মত হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই! অভ্যাসের কি অপার মাহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচত গহনাও ভাল লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদক দ্রব্যে যতই সর্ব্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না। সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়াও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি-গর্ব্বে স্ফীতা হই!

অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন কোন ভগ্নী আমাকে পুরুষপক্ষেরই গুপ্তচর মনে করিতে পারেন। অর্থাৎ ভাবিলেন যে, আমি পুরুষদের টাকা স্বর্ণকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হয়ত এরূপ কৌশলে ভগ্নীদিগকে অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহা নয়, আমি আপনাদের জন্যই দু'কথা বলিতে চাই। যদি অলঙ্কারের উদ্দেশ্য পুরুষদের টাকার শ্রাদ্ধ করাই হয়, তবে টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে দুই একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

আপনার ঐ জড়োয়া বাড়ীর আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যান, তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য হার পরাইতে পারেন! বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পর্দ্দার কড়া (drawing room Gi curtain ring) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই "স্বামী" নামধারী নরবরের টাকার বেশ শ্রাদ্ধ হইবে!! অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্য দেখান বই ত নয়। ঐরূপে ঐশ্বর্য্য দেখাইবেন। নিজের শরীরের দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিবেন কেন? উক্ত প্রকারে গহনার সদ্ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম লোকে আপনাকে পাগল বলিবে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিলেই চলিবে[৬]। এ পোড়া সংসারে কোন ভাল

---

[৬] অলঙ্কার পরা ও উক্তরূপে টাকার শ্রাদ্ধ করা একই কথা। কিন্তু আশা করা যায় যে উক্ত প্রকারে টাকার শ্রাদ্ধ না করিয়া টাকার সদ্ব্যয় করাই অনেকে ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন।

কাজটা বিনা কেশে সম্পাদিত হইয়াছে? "পৃথিবীর গতি আছে" এই কথা বলাতে মহাত্ম গ্যালিলও (Galileo) কে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন সাধুলোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভাল কথা বা ভাল কাজের বর্ত্তমানে আদর হয় না।

বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্ব্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোন বিষয় তর্ক করিতে গেলে বলেন, "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব"! কবিবর সা'দী পুরুষদের উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, "আয় মরদাঁ বকুশিদ্, জামা-এ-জানাঁ ন পুষিদ্"! অর্থাৎ "হে বীরগণ! (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীর পোষাক পরিও না।" আমাদের পোষাক পরিলে তাহাদের অপমান হয়! দেখা যাউক সে পোষকটা কি,-কাপড় ত তাঁহাদের ও আমাদের প্রায় একই প্রকার। একখণ্ড ধূতি ও একখণ্ড সাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুমাত্র তারতম্য আছে কি? যে দেশে পুরুষ পা-জামা পরে, সে দেশে নারীও পা-জামা পরে। "Ladies's jacket" শুনা যায়, "Gentlemen's jacket" ও শুনিতে পাই! তবে "জামা-এ-জানাঁ" বলিলে কাপড় না বুঝাইয়া সম্ভবতঃ রমণীসুলভ দুর্ব্বলতা বুঝায়।

পুরুষজাতি বলেন যে, তাঁহার আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া-ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলতঃ তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি। তাঁহারা আরও বলেন, "তাহাদের সুখের সামগ্রী, আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব-আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন?" আমরা ঐ শ্রেণীর বক্তাকে তাঁহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই; কিন্তু

ভ্রাতঃ! পোড়া সংসারটা কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে--ইহা জটিল কুটিল কঠোর সংসার! সত্য বস্তু--কবিতা নহেঃ

“কাব্য উপন্যাস নহে-এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে-ইহা প্রকৃত ভবন”-

তাই যা কিছু মুস্কিল!! নতুবা আপনাদের কৃপায় আমাদের কোন অভাব হইত না। বঙ্গবালা আপনাদের কল্পিত বর্ণনা অনুসারে “ক্ষীণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, অবলা, ভয়-বিহবলা-” ইত্যাদি হইতে হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর (Aerial body) প্রাপ্ত হইয়া বাস্পরূপে অনায়াসে আকাশে বিলীন হইতে পারিতেন!! কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তদ্রুপ সুখের নহে; তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাইঃ

“অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।”

বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা উইএর ভোগ্য হয়। কবি বেশ বলিয়াছেনঃ

“কেন নিবে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে,
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।”

সুতরাং দেখা যায়, তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ।

বিপৎসঙ্কুল সংসার হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভর ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদে রোদন করিয়া থাকি!!

ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের “নাকি কান্নার” কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপের নীরবে সহ্য করি।

আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই[৭]।

---

[৭] সেদিন (গত ৯ই এপ্রিলের) একখানা উর্দ্দু কাগজে দেখিলামঃ- তুরস্কের স্ত্রীলোকেরা সুলতান-সমীপে আবেদন করিয়াছেন যে, "চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা ব্যতীত আমাদের আর কোন কাজ নাই। আমাদিগকে অন্ততঃ এ পরিমাণ শিক্ষা দেয়া হউক, যাহার সাহায্যে যুদ্ধের সময় আমরা আপন আপন বাটী এবং নগর পুরুষদের মত বন্দুক কামান দ্বারা রক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা ঐ আবেদনে নিম্নলিখিত উপকারগুলি প্রদর্শন করিয়াছেনঃ

(১) প্রধান উপকার এই যে নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ায় যেক্ষেতি হয়, তাহা আর হইবে না। (যেহেতু "অবলা"গণ নগর রক্ষা করিবেন!)
(২) সন্তান সন্ততিপূর্ণ শৈশব হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হইবে। পিতা মাতা উভয়ে সেপাহী হইলে শিশুগণ ভীরু, কাপুরুষ হইবে না।
(৩) তাঁহারা বিশেষ এক নমুনার উর্দ্দি (Uniform) প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশ এবং সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিবে।
(৪) অবরোধপ্রথার সম্মান রক্ষার্থে এই স্থির হইয়াছে যে, অন্ততঃ তিন বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক পরিবারের সৈনিক পুরুষেরা আপন আপন আত্মীয় রমণীদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য ঘরে ঘরে দেখা দিবেন। উক্ত মহিলাগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমরা উর্দ্দির (Uniform এর) খরচের জন্য গবর্ণমেন্টকে কষ্ট দিব না। কেবল বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সরকার হইতে গাইতে আশা করি।" দেখা যাইক, সুলতান মহোদয় এ দরখাস্তের কি উত্তর দেন।

উপরোক্ত সংবাদ সত্য কি না, সেজন্য সেই পত্রিকাখানি দায়ী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তুরস্ক-রমণীদের ওরূপ আকাঙ্খা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। ইতিহাসে শুনা যায়, পূর্ব্বে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। একটা যেমন তেমন "মুসলমানী পুঁথি"র পাতা উল্টাইলেও আমরা দেখিতে পাই- (যুদ্ধ করিতে যাইয়া)-

"জয়গুণ নামে বাদশাহজাদী কয়েদ হইল যদি,
আর যত আরব্য সওয়াব" ইত্যাদি।

বলি, এদেশের যে সমাজপতিগণ "লেডীকেরাণী" হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked হন)-যাঁহারা অবলার হস্তে পুতুল সাজান ও ফুলের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কোন

ব্যাঘ্র ভল্লুক ও দূরে থাকুক, আরসুলা জলৌকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই! এমনকি অনেকে মূর্চ্ছিতা হন! একটি ৯/১০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়ীশুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চীৎকার দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাসা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি-আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় বরং আমোদ বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।

ভীরুতার চিত্র ত দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্ব্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় "অচেতন পদার্থ" হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing room এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা! আপনি কখন বেহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝী নামধেয় জড়পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটি বধূবেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইহাকে কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরে (museum এ) বসাইয়অ রাখিলে রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে (পর্দার অনুরোধে?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরীতে পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বানাত মণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই দুলহিনবেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)"। ইহার সর্ব্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার! শরীরের কোন অংশে কত ভরি সোণা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

শ্রমসাধ্য কার্য্যের ভার দেওয়ার কল্পনাই করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ লেডীযোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কি করিবেন? মূর্চ্ছা যাইবেন না ত?

১। মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্দ্ধ সের (৪০ ভরি)।
২। কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এর পোয়া (২৫ ভরি)।
৩। কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা)।
৪। সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি)।
৫। কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)।
৬। চরণযুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা!!

বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাস সার্দ্ধ চারি ইঞ্চি[৮]! পরিহিত পা-জামা বেচারা সলমা চুমকির কারুকার্য্য ও বিবিধ প্রকারের জরির (গোটা পাট্রার) ভারে অবরত! আর পা-জামা ও দোপাট্রার (চাদরের) ভারে বেচারী বধূ ক্লান্ত!

ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়পদার্থ না হইয়া কি করিবেন? সর্ব্বদাই তাঁহার মাথা ধরে; ইহার কারণ ত্রিবিধ-

(১) সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কষিয়া কেশবিন্যাস, (২) বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, (৩) অর্দ্ধেক মাথায় আটা সংযোগে আফশাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুমকি বসান হইয়াছে; ভ্রযুগ চুমকি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙ্গের বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা সংযোগে বসান হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।

এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটী হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। অজীর্ণ ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ তাঁহার চিরসহচর।

---

[৮] কোন কোন নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চি এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৯ ইঞ্চি হয়! ওজন এক ছটাক!!

শরীরে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্ত্তি থাকে না। সুতরাং ইহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চিররোগী। এমন স্বাস্থ্য লইয়া চিররোগী জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কি মনে হয়? আমরা নিজের ও অপরের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিলে যে শিক্ষালাভ করি, ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাখী শাখী হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটি আতার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালীন কোন পুস্তকে ছিল না। ঐ বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র আঁকিতে সম হইলাম! যাহা হউক, আমি উক্ত বধূবেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, "অভাগীর ইহলোক পরলোক-উভয়ই নষ্ট।" যদি ঈশ্বর হিসাব নিকাশ লয়েন যে, "তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" তাহার উত্তরে বেগম কি বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ীর একটি মেয়েকে বলিলাম, "তুমি যে হস্তপদদ্বারা কোন পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কি জওবাবাদিহি (explanation) দিবে? সে বলিল, "আপকা কহনা ঠিক হ্যায়"-এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলা-ফেরা করে, আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, "শুধু ঘুরা ফেরা কথাটার উত্তরে হাসির একটা গররা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম, "উল্টা বুঝলি রাম!" কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূরে-ভরসা কেবল পতিতপাবন।

আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন-কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য্য নহে। তাই একটু আশার আলোক দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে মাফ করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"!

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকরী গ্রহণ অসম্ভব সুতরাং এই সকল চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফাঁকা তর্কের অনুরোধে আবার কোন নেটীভ খ্রীষ্টিয়ান হয়ত মনে করিবেন যে রমণীয় জ্ঞান-পিপাসাই মানবজাতির কারল! যেহেতু শাস্ত্রে (Genesis এ) দেখা যায়, আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন[৯]।

যাহা হউক "শিক্ষা"র অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষ "অন্ধ-অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই মতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐগুণের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত পদ, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত, দ্বারা সৎকার্য্য করি, চক্ষুদ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা

---

[৯] পরন্তু ইউরোপীয় খৃষ্টানদের বিশ্বাস যে Eve অভিশপ্তা হইয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু যীশুখৃষ্ট আসিয়া নারীজাতিকে সে অভিশাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, Through women came aurse and sin; and through women came blessing and salvation also· (ভাবার্থ-নারীর দোষে জগতে অভিশাপ ও পাপ আসিয়াছে এবং নারীর কল্যাণেই আর্শীর্ব্বাদ এবং মুক্তিও আসিয়াছে(। পুরুষ খ্রীষ্টের পিতা হয় নাই, কিন্তু রমণী যীশুখ্রীষ্টের মাতৃপদ প্রাপ্তে গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি-তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশ করা বিদ্যা"কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তির বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছিঃ

যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দ্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত করি, বিজ্ঞানবিদ্ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিন্মলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা-বালুকা বিশেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal); কর্দ্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক! এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন, ভগিনী! সেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দ্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা মাণিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব?

মনে করুন আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জ্জনী দিয়া বলিলেন, "যা, আমার অমুক বাড়ী পরিস্কার রাখিস্"। দাসী সম্মার্জ্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল-কোন কালে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ী ক্রমে আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল! অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্য্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ীর দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কি হইবে? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ী পরিস্কার রাখিলে আপনি খুসী হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে-এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

আমাদের উচিত যে স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি "ভরসা কেবল পতিতপাবন" কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন যে নিজে নিজের সাহায্য করে, ("God helps

those that help themselves" তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে পুরুষের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয় স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অম হইয়া পরের উপার্জ্জিত ধনভোগে বাধ্য হয়। এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্য্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্ম্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জ্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন! এবং স্ত্রী তাহাঁর প্রভুত্বে আপত্তি করেন না[১০]। ইহার কারণ এই যে বহুকাল হইতে নারীহৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই-এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাইঃ

"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি!"

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল" এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি[১১]! (অর্থাৎ ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায়

---

[১০] বঙ্গীয় কোন কোন সমাজের স্ত্রীলোক যে স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে-ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

[১১] সমাজের সমঝদার)reasonable) পুরুষেরা প্রাণদণ্ডের বিধান নাও দিতে পারেন, কিন্তু "unreasonable" অবলাসরলাগণ; (যাঁহারা যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না, তাঁহারা (শতমুখী ও আঁইস বঁটীর ব্যবস্থা নিশ্চয় দিবেন, জানি!!

না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে (“but nevertheless it (Earth) does move”)!! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পার্সী নারীদের একটি উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি এক খণ্ড উর্দ্দু সংবাদপত্র হইতে অনূদিত হইলঃ

এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সী মহিলাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্ব্বে ইহার নাম মাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দায় (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ পর্দা থাকিত। অন্যের জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন!! গাড়ীর ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজিকালি পার্সী মহিলাগণ পর্দা ছাড়িয়াছেন! খোলা গাড়ীতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পর্দার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছেন, “পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত হইল”।

কই পৃথিবী ও ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও,-সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। এবং আমরা গোলামজাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষমতা[১২] লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখণ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টার, লেডীজজ-সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব!! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী'র" গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না[১৩]?

আমরা যদি রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের

---

[১২] আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষদের সমকক্ষমতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ। একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র, আমরা সমাজের কন্যা !আমরা ইহা বলি না যে "কুমারের মাথায় যেমন উষ্ণীব দিয়াছেন, কুমারীর মাথায়ও তাহাই দিবেন!" বরং এই বলি, কুমারের মস্তক শিরস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয় করা হয়, কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়নাখানা প্রস্তুতের নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।"

[১৩] কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে কেন? কৃষক প্রজা থাকিতে জমীদার কাঁধে লাঙ্গল লইবেন কেন? শুধু রাজার চাকরী ছাড়া আর কিছু উচ্চদরের কার্য্য কি আমরা করিতে পারি না? কেরাণী ইত্যাদির কথা কেবল উদাহরণ স্বরূপ বলা হইল। যেমন স্বর্গের বর্ণনায় বলিতে হয়- সেখানে শীত নাই,-গ্রীস্ম নাই, কেবল চিরবসন্ত বিরাজমান থাকে। স্বর্গোদ্যানে মরকত লতিকায় হীরক-প্রসূন ফোটে!! তাই আমাদের উচ্চ আশা বুঝাইবার নিমিত্ত লেডীভাইসরয় হইবার কথা না বলিলে কিসের সহিত আমাদের সে উচ্চদরের কার্য্যের উপমা দিব?

আবার ইহাও বলি, লেডীকেরাণী হওয়ার কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয় না। আমেরিকায় লেডীকেরাণী বা লেডীব্যারিষ্টার প্রভৃতি বিরল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল, যখন অন্যান্য দেশের মুসলমানসমাজে "স্ত্রীকবি, স্ত্রীদার্শনিক, স্ত্রীঐতিহাসিক, স্ত্রীবৈজ্ঞানিক, স্ত্রীবক্তা, স্ত্রীচিকিৎসক, স্ত্রীরাজনীতিবিদ্" প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোসলেমসমাজে ওরূপ রমণীরত্ন নাই।

পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোক ১ পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩ আর চাকরাণীর খোরাকী ২। অবশ্য কখন কখন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশী পাইতেও দেখা যায়।

যদি বল, আমরা দুর্ব্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে। তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ম হয় কি না!

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খাঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে- একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা-উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে-সর্ব্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন-আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন! তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন! এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অসগ্রর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী সহকর্ম্মিণী সহধর্ম্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্ম্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

ভরসা করি আমাদের সুযোগ্য ভগ্নীগণ ও বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আমরা দুর্ব্বল নিরীহ বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী শব্দে কেমন সমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙ্গালী কোন বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলে তরলতা-এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালী গঠিত হইয়াছে! আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রুপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্ত্তিমতী কবিতা-যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজী ধরণের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা (drawing room) এবং বাঙ্গালী তাহাতে সাজসজ্জা (drawing room suit)! যদি ভারতবর্ষকে একটি সরোবর মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষসমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা!![১৪] অত্রএব আমরা মূর্ত্তিমান কাব্য।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি,-পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল-অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি-ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও মধুর। অতত্রব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক-সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেহে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিস্প্রয়োজন; এখন পোষাক পরিচ্ছদের কথা বলি।

---

[১৪] "নায়িকা" বলিয়া আমি ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ করি নাই। কারণ অনেকে বাঙ্গালী পুরুষকে "বেচারী" বলে। উর্দ্দু ভাষায় পুরুষকে "বেচারা" ও স্ত্রীলোককে "বেচারী" বলে। যদি আমরা "বেচারী" হইতে পারি, তবে, "পদ্মিনী", "নায়িকা" ও "পুরুষিকা" হইতে দোষ কি?

আমাদের বর অঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনিগঠিত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলায় ধূতি ও চাদর। ইহাতে বায়ু সঞ্চলনের (Ventilation এর) কোন বাধা বিঘ্ন হয় না! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোট শার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্দ্ধাঙ্গী-হেমাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গিগণ তদনুকরণে ইংরাজললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিক জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহার অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম "হাওয়ার সাড়ী" পরেন! বাঙ্গালীর সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলব্ধ।

বাঙ্গালীর গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসী, কাগজ ও অকান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুই চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়, বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্ধবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্জাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জ্জন করিয়াছি। এই জন্য আমাদের দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিষ নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য-নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার রোগবর্দ্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিত্তলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটী, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটী সোণা রূপা জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষতঃ আজি কালি কোন জিনিষটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যতন্ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক "দীর্ঘকেশী" তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে "হ্রস্বকেশী" তৈল আবিস্কার করি। যদি কেহ "কৃষ্ণকেশী" তৈল বিক্রয় করেন, তবে আমরা "শুভ্রকেশী" বাহির করি। "কুন্তলীনের" সঙ্গে "কেশলীন" বিক্রয় হয়। বাজারে "মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী" ঔষধ আছে, "মস্তিষ্ক উষ্ণকারী" দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিস্প্রোয়জনীয় জিনিষ হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়-পাশ বিক্রয়। এই পাশ বিক্রেতার নাম "বর" এবং ক্রেতাকে "শ্বশুর" বলে। এক একটি পাশের মূল্য কত জান? "অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এম, এ, পাশ অমূল্যরত্ন, ইহা যে সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য-এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কিনা তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ!

এখন কৃষিকার্য্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্নবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কৃষিবিভাগের কার্য্য (Agriculture) করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্ব্বর (Brain culture) করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্ব্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপো মুখস্থ বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ। এবং কৃষিকার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M.R.A.C পাশ করা সহজ! আইনচর্চ্চা কথা অপেক্ষা কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চ্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া দুর্ভি সমাচার (Famine Report) পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না! দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তা'তে আমাদের কি?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। যথাঃ

(১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা "রাজা" উপাধি লাভ সহজ।

(২) শিল্পকার্য্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B. Sc. I D. Sc. পাশ করা সহজ।

(৩) অল্প বিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভ জন্য অর্থ ব্যয় করা

সহজ।

(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড় লোকদের মৃত্যুদুঃখে "শোক সভার" সভ্য হওয়া সহজ।

(৫) দেশের দুর্ভি নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।

(৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা (অর্থাৎ health ও cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্কগণ্ডে!) কালিডোর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, milk of rose ও Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।

(৮) কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎণাৎ বাহু বলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্ত্তিমান আলস্য-আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নির উত্তাপ সহিবেন? তাঁহারা কোমলাঙ্গ-তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা; আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচন না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া বিদ্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিত্র দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে (১) তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর (২) জবেহ্ কর, তারপর (৩) ফাঁসী দাও!!

আমরা সকলেই কবি-আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশী। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশী। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশী বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন বিষয়টা বাদ দিই? "ভগ্ন শূর্ণ", "জীর্ণ কাঁথা", "পুরাতন চটীজুতা"-কিছুই পরিত্যজ্য নহে। আমরা আবার কত নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি; যথা-"অতি শুভ্রনীলাম্বর", "সাশ্রুসজলনয়ন" ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপ-প্রলাপপূর্ণ পদ্যের পদ্যের "অশ্রুজলের" বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে! সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।[১৫]

নবনূর, মাঘ ১৩১০

[১৫] গত ১৩১০ সালে 'নিরীহ বাঙ্গালী' লিখিত হইয়াছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান সালে আর বাঙ্গালী 'পুরুষিকা' নহেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন শুভ পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা কে জাতিন? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমরা সাহসী বাঙ্গালী।

কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক। তাই অবলাজাতির উন্নতির পথ আবিস্কার করিবার পূর্ব্বে তাহাদের অবনতির চিত্র দেখাইতে হয়। আমি "স্ত্রাজাতির অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধে ভগিনীদিগকে জানাইয়াছি যে, আমাদের একটা রোগ আছে-'দাসত্ব'। সে রোগের কারণ এবং অবস্থা কতক পরিমাণে ইতঃপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, সেই রোগ হওয়ায় আমাদের সামাজিক অবস্থা কেমন বিকৃত হইয়াছে। ঔষধ পথ্যের বিধান স্থানান্তরে দেওয়া হইবে।

এইখানে গোঁড়া পর্দাপ্রিয় ভগ্নীদের অবগতির জন্য দু একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে পর্দাবিদ্বেষ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই।

সে প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারীজাতির উল্লেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধে বন্দিনী থাকেন? অথবা তাঁহারা পর্দানশীল নহেন বলিয়া কি আমি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি? আমি মানসিক দাসত্বের (enslaved মনের) আলোচনা করিয়াছি।

কোন একটা নূতন কাজ করিতে গেলে সমাজ প্রথমতঃ গোলযোগ উপস্থিত করে, এবং পরে সেই নূতন চাল চলন সহিয়া লয়, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্সী মহিলাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বে তাঁহারা ছত্রব্যবহারেরও অধিকারিণী ছিলেন না, তারপর তাঁহাদের বাড়াবাড়িটা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তবু ত পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই। এখন পার্সী মহিলাদের পর্দামোচন হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনার ত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পার্সী পুরুষগণ কেবল অন্ধভাবে বিলাতী সভ্যতার জীবনীশক্তির ত কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না-

তাঁহারা যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরুষ যখন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখিতেন, তাঁহারা তখন সেইখানে থাকিতেন। আবার পুরুষ যখন তাঁহাদের "নাকের দড়ী" ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা পর্দার বাহির হইয়াছে! ইহাতে রমণীকুলের বাহাদুরী কি? ঐরূপ পর্দা-বিরোধ কখনই প্রশংসনীয় নহে।

কলম্বস যখন আমেরিকা আবিস্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন লোকে তাঁহাকে বাতুল বলে নাই কি? নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, ইহাও বাতুলতা বই আর কি?

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না। লোকে কালী, শীতলা প্রভৃতি রাস-প্রকৃতির দেবীকে ভয় করে, পূজা করে, সত্য। কিন্তু সেইরূপ বাঘিনী, নাগিনী, সিংহী প্রভৃতি "দেবী" ও কি ভয় ও পূজা লাভ করে না? তবেই দেখা যায় পূজাটা কে পাইতেছেন,-রমণী কালী, না রাসী নৃমুণ্ডমালিনী?

নারীকে শিক্ষার দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পর্দানশীল ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গী, রাণী, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্ম্মিক-সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালবাসিতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে; হারান পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহলাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলিয়া দিতে পারে,-কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ! বালক তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে!!

রামচন্দ্র “স্বামিত্বের” ষোল আনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা?-কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেন না, বুঝিয়া কার্য্য করিতে গেলে স্বামিত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যাইত না!

আচ্ছা, দেশ কালের নিয়মানুসারে কবির ভাষায় স্বর মিলাইয়া না হয় মানিয়া লই যে, আমরা স্বামীর দাসী নহি-অর্দ্ধাঙ্গী। আমরা তাঁহাদের গৃহে গৃহিণী, সরণে (না হয়, অন্ততঃ তাঁহাদের চাকুরী উপলক্ষে যথা তথ্য) অনুগামিনী, সুখ দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্য সহচরী ইত্যাদি।

কিন্তু কলিযুগে আমাদের ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গী লইয়া পুরুষগণ কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছেন, তাহা কি কেহ একটু চিন্তাচক্ষে দেখিয়াছেন? আক্ষেপের (অথবা “প্রভু”দের সৌভাগ্যের) বিষয় যে, আমি চিত্রকর নহি-নতুবা এই নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গ তাঁহাদের কেমন অপরূপ মূর্ত্তি হইয়াছি, তাহা আঁকিয়া দেখাইতাম।

শুক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ বলেন যে, আমাদের সাংসারিক জীবনটা দ্বিচক্র শকটের ন্যায়-ঐ শকটের এক চক্র পতি, অপরটি পত্নী। তাই ইংরাজী ভাষায় কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিণী (partner) উত্তমার্দ্ধ (better half) ইত্যাদি বলে। জীবনের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর, সহজ নহেঃ

“সুকঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার
সুশৃঙ্খল কে পারে চালাতে?
রাজ্যশাসনের রীতি নীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।”

বোধ হয় এই গার্হস্থ্য ব্যাপারটাকে মস্তকস্বরূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে তাহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়াছেন। তবে দেখা যাউক বর্ত্তমান যুগে সমাজের মূর্ত্তিটা কেমন।

মনে করুন কোন স্থানে পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ দর্পণ আছে, যাহাতে আপনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আপনার দক্ষিণাঙ্গভাগ পুরুষ এবং বামাঙ্গভাগ স্ত্রী। এই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখুনঃ

আপনার দক্ষিণ বাহু দীর্ঘ (ত্রিশ ইঞ্চি) এবং স্থূল, বামবাহু দৈর্ঘ্যে চব্বিশ ইঞ্চি এবং ক্ষীণ। দক্ষিণ চরণে দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি, বাম চরণ অতিশয় ক্ষুদ্র। দক্ষিণ স্বন্ধ উচ্চতায় পাঁচ ফিট, বাম স্কন্ধ উচ্চতায় চারি ফিট! (তবেই মাথাটা সোজা থাকিতে পারে না, বাম দিকে ঝুঁকিতে পড়িতেছে! কিন্তু আবার দক্ষিণ কর্ণভারে বিপরীত দিকেও একটু ঝুঁকিয়াছে!) দক্ষিণ কর্ণ হস্তিকর্ণের ন্যায় বৃহৎ, বাম কর্ণ রাসভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ! দেখুন!-ভাল করিয়া দেখুন, আপনার মূর্ত্তিটা কেমন!! যদি এ মূর্ত্তিটা অনেকের মনোমত না হয়, তবে দ্বিচক্র শকটের গতি দেখাই। যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

সমাজের বিধি ব্যবস্থা আমাদিগকে তাহাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়াছে; তাঁহাদের সুখ দুঃখ এক প্রকার, আমাদের সুখ দুঃখ অন্য প্রকার। এস্থলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নবদম্পতীর প্রেমালাপ" কবিতার দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম-

"বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া?
"কনে। পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

*

"বর। কি করিছ বনে কুঞ্জভবনে?
"কনে। খেতেছি বসিয়া টোপা কূল।

*

“বর। জগৎ ছানিয়া, কি দিব আনিয়া জীবন করি ক্ষয়?
তোমা তবে সখি, বল করিব কি?
“কনে। আরো কূল পাড় গোটা ছয়।

*

“বর। বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?
“কনে। দেব পুতুলের বিয়ে।”

সুতরাং দেখা যায় কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বীকার ছায়াতুল্য সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর “বোধোদয়” পর্য্যন্ত!

স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতের বিচরণ করেন, সূর্য্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্ব্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্ম্মিনী কই? বোধ হয়, গৃহিণী যদি আপনার সঙ্গে সূর্য্যমণ্ডলে যান, তবে তথায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই উত্তাপে বাস্পীভূত হইয়া যাইবেন! তবে সেখানে গৃহিণীর না যাওয়াই ভাল!!

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়ে চর্ব্ব্য, চোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারি খানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশী আবশ্যই নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ, এ, বি, এ, পাশ হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে! তাহাদের বিদ্যাপরীক্ষায়

এ কথার সত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে।[১৬]
আমার জনৈক বন্ধু তাঁহার ছাত্রকে উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিঙনির্ণয়ের কথা (cardinal points) বুঝাইতেছিলেন। শেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত পশ্চিমে এবং রাম হস্ত পূর্ব্বে থাকে, তবে তোমার মুখ কোন দিকে হইবে?" উত্তর পাইলেন "আমার পশ্চাৎ দিকে!"

যাঁহারা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট "পাহলওয়ান" দেখিতে চাহেন কি না? তাঁহাদের দৌহিত্র ঘুষিটা খাইয়া থাপড়টা মারিতে পারে, এরূপ ইচ্ছা করেন কি না? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁহারা সুকুমারী গোলাপ-লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!! আর যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে দৌহিত্রও বলিষ্ঠ না হয়, বরং পয়জার পেটা হইয়া নত মস্তকে উচ্চৈঃস্বরে বলে, "মাৎ মারো! চোট লাগতা হায়!!" এবং পয়জার লাভ শেষ হইলে দূরে গিয়া প্রহারকর্ত্তাকে শাসাইয়া বলে যে, "কায় মারতা থা? হাম নালিশ করেগা!" তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আমার বক্তব্য বুঝাইতে অক্ষম।

---

[১৬] "দাসী" পত্রিকা হইতে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি নাঃ
প্রশ্ন। When was Cromwell born (ক্রমওয়েলে জন্ম কখন হইয়াছিল(?
উত্তর। In the year 1649 when he was fourteen years old (১৬৪৯ সালে যখন তিনি চৌদ্দ বৎসরের ছিলেন(।
প্রশ্ন। Describe his continental policy (তাহার রাষ্ট্রীয় নীতি বর্ণনা কর(।
উত্তর। He was honest adn truthful and he had nine children (তিনি সাধু প্রকৃতি এবং সত্যবাদী ছিলেন এবং তাঁহার নয়জন সন্তানসন্ততি ছিল(।
প্রশ্ন। What is the adjective of ass (গর্দ্দভের বিশেষণ কি(?
উত্তর। Assansole (আসানসোল(।
প্রশ্ন। Who was Chandra Gupta (চন্দ্রগুপ্ত কে(?
উত্তর। Chandra Gupta was the granddaughter of Asoka (চন্দ্রগুপ্ত অশোকের দৌহিত্রী(।
"পরীক্ষারহস্য। 'কলা ঝলসাইতে লাগিল' ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, 'roasted some plantations' আর একজন লিখিয়াছেন, 'roasted some plantagenets' অপর একজন লিখিয়াছেন, 'roasted some plaintiffs' কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা কল্পিত উত্তর। সত্য সত্যই এরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে।"

খ্রীষ্টিয়ান সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্দ্ধই (Better half) তাঁহার অংশীর (partner এর) জীবনে আপন জীবনে মিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া যান না। স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নূতন টুপীর (bonnet এর) চিন্তা করিতেছেন! কারণ তাঁহাকে কেবল মূর্ত্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে-তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য (prosaic) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

এখন মুসলমানসমাজে প্রবেশ করা যাউক। মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের "অর্দ্ধেক", অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা "আড়াই জন" হই! আপনারা "মুহম্মদীয় আইনে" দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমীদারী পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন কার্য্যতঃ কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।

আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশী। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্দ্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারি জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুই জন শিক্ষয়ত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি, এ, পর্য্যন্ত) পাশ করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাশ (এন্ট্রান্সি পাশ ও এফ, এ, ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না! সে স্থলে ভ্রাতা

"শমস-উল-ওলামা"[১৭] সে স্থলে ভগিনী "নজম-উল-ওলামা" হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্তঃপুর গগণে অসংখ্য "নজমন্নেসা" "শমসন্নেসা" শোভা পাইতেছেন বটে। কিন্তু আমরা সাহিত্য-গগনে "নজম-উল-ওলামা" দেখিতে চাই!

আমাদের জন্য এ দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ-প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরাণ শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টীয়াপাখীর মত আবৃত্তি কর। কোন পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে "হাফেজা" করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কোরাণখানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই "হাফেজ"। আমাদের আরবী শিক্ষা ঐ পর্য্যন্ত! পারস্য এবং উর্দ্দু শিখিতে হইলে, প্রথমেই "করিমা ববখশা এবর হালেমা" এবং একেবারে (উর্দ্দু) "বানাতন নাশ" পড়![১৮] একে আকার ইকার নাই, তাতে আবার আর কোন সহজপাঠ্য পুস্তক পূর্ব্বে পড়া হয় নাই সুতরাং পাঠের গতি দ্রুতগামী হয় না। অনেকের ঐ কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই কন্যা-জীবন শেষ হয়। বিবাহ হইলে বালিকা ভাবে, "যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল!" কোন কোন বালিকা রন্ধন ও সূচীকর্ম্মে সুনিপুণা হয়। বঙ্গদেশের বালিকাদিগকে রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দ্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সলমা চুমকির কারুকার্য্য, উলের জুতা মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্য্যন্ত।

---

১৭ "শমস-উল-ওলামা", পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ঐ শব্দগুলি অনুবাদ এইরূপ হয় -শমসল, sun; ওলামা, ("আলম" শব্দের বহুবচন (learned men· এইরূপ নজম-উল-ওলামা অর্থে the star of the learned men (or women!) বুঝিতে হইবে।

১৮ এইখানে একটি দশ বর্ষের বালিকার গল্প মনে পড়িল। পল্লীগ্রামে অনেকের বাড়ী ধান ভানিবার জন্য "ভানানী" নিযুক্ত হয়। সেই বালিকা "বানাতন নাশ" পড়িতে যাইয়া হোসেন-আবার মেজাজের বর্ণনাট্য হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষা ভানানীদের ধানভানা কাজটা সহজ মনে করিত !তাই সুযোগ পাইলেই সে ঢেঁকিশালে গিয়া দুই এক সের ধান্যের শ্রাদ্ধ করিত !সে ধান্য হইতে তণ্ডুল পরিস্কার পাওয়া যাইত না-তাহা "Whole meal " ময়দার ন্যায় ধান্য-তুঁষ-তণ্ডুল মিশ্রিত এক প্রকার অদ্‌ভুদ সামগ্রী হইত। যে রোগীদের জন্য হোলমিল ময়দার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাঁহাদের জন্য উক্ত হোল-মিল-তণ্ডুলচূর্ণ উপকারী খাদ্য, সন্দেহ নাই!!

যদি ধর্ম্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) আপনাদের হিসাব নিকাশ লয়েন যে, "তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ?" তবে আপনারা কি বলিবেন?

পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশি অত্যাচার অনাচার করিয়াছে, তখনই এক-একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল; আরববাসিগণ কন্যাহত্যা করিতেছিল তখন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কন্যাকুলের রকস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন-কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।

আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দ্দশা। তবে আইস ভগিনীগণ! আমরা সকলে সমস্বরে বলিঃ

"করিমা ববখশা এবর হালেমা!" করিম (ঈশ্বর) অবশ্যই কৃপা করিবেন। যেহেতু "সাধনার সিদ্ধি।" আমরা "করিমের" আনুগ্রহলাভের জন্য যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব। আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের "অর্দ্ধেক" নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত-পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানী হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্দ্ধেক! সেরূপ ত নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহ মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?

আমি এবার রন্ধন ও সূচীকার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আবার যেন কেহ মনে না করেন যে আমি সূচীকর্ম্ম ও রন্ধনশিক্ষার বিরোধী। জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্যে ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য-প্রার্থী, মেঘও আবার নদীর ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদম্বিনীর "স্বামী', না কাদম্বিনী তরঙ্গীণীর "স্বামী", এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি।

কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুরায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্য-প্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে "স্বামী" বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে "স্বামী" ভাবিবেন কেন?

আমরা উত্তমার্দ্ধ (better halves) তাঁহারা নিকৃষ্টার্দ্ধ (worse halves), আমরা অর্দ্ধাঙ্গী, তাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গ। অবলার হাতেও সমাজের জীবন মরণের কাঠি আছে, যেহতু "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা কিম্বা তেজস্বিতা জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃমহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী না করেন!

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমনা সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি, এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি। অনেক

সময় “হাজার হোক ব্যাটা ছেলে!” বলিয়া ব্যাটা ছেলেদের দোষ মা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি। এই ত ভুল।[১৯]

আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি। তাঁহাদের ধর্ম্মবন্ধন বা সমাজজবন্ধন ভিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে পাহি না। মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রীষ্টানী ছাড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

অনেকে হয়ত ভয় পাইয়াছেন যে, বোধ হয় একটা পত্নীবিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপকে রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্রে হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন- শ্যামলা, চোগা, আইন কানুনের পাঁজি পুঁথি লুঠিয়া লইবেন! অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যত্রে দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে-নিশ্চিন্ত থাকুন।

পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছি। ভারতে ভিক্ষু ও ধনবান-এই দুই দল লোক অলস; এবং ভদ্রমহিলার দল কর্ত্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে। আমাদের আরাম-প্রিয়তা খুব বাড়িয়াছে। আমাদের হস্ত, পদ, মন, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। দশজন রমণীরত্ব একত্র হইলে ইহার উহার-বিশেষতঃ আপন আপন অর্দ্ধাঙ্গের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাকপটুতা দেখায় আবশ্যক হইলে কোন্দলও চলে।

---

[১৯] এস্থলে জনৈক নারীহিতৈষী মহাত্মার উর্দ্দু গাথা মনে পড়িল। তিনি)১৯০৫ খৃষ্টাব্দের কোন মাসিক পত্রিকায় (লিখিয়াছেন, “জগতে তোমাদের নিন্দাগীতি এত দূর উচ্চরাগে গাওয়া গিয়াছে যে শেষে তোমরা ও জগতের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিলে যে ‘আমরা বাস্তবিক বিদ্যালাভের উপযুক্ত নহি।’ সুতরাং মূর্খতার কুফল ভোগের নিমিত্ত তোমরা নত মস্তকে প্রস্তুত হইলে।”
কি চমৎকার সত্য কথা !জগদীশ্বর উক্ত কবিকে দীর্ঘজীবী করুন!

আশা করি এখন “স্বামী’ স্থলে “অর্দ্ধাঙ্গ” শব্দ প্রচলিত হইবে।

নবনূর, আশ্বিন ১৩১১

ইতঃপূর্ব্বে আমি "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে আমাদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু সত্য কথা সর্ব্বদাই কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু বলিয়া অনেকে উহা পছন্দ করেন নাই।[২০] অতঃপর "অৰ্দ্ধাঙ্গী" প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নারী ও নর উভয়ে একই বস্তুর অঙ্গবিশেষ। যেমন একজনের দুইটি হাত কিংবা কোন শকটের দুইটি চক্র, সুতরাং উভয়ে সমতুল্য, অথবা উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। একচক্ষুবিশিষ্ট ব্যাক্তিকে লোকে কাণা বলে।

যাহা হউক আধ্যাত্মিক সমকতার ভাষা যদি স্ত্রীলোকেরা না বুঝেন, তবে উচ্চ আকাঙ্খা বা উচ্চভাবের কথায় কাজ নাই। আজি আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় আপনারা সমস্বরে বলিবেনঃ

"সুগৃহিণী হওয়া"

বেশ কথা। আশা করি আপনারা সকলেই সুগৃহিণী হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সুগৃহিণী হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই। কারণ আমাদের বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা আমরা লাভ করিতে পারি না। সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করেন। পুরুষ বিদ্যালাভ করেন অন্ন উপার্জ্জনের আশায়, আমরা বিদ্যালাভ করিব কিসের আশায়? অনেকের মত আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমাদিগকে অন্নচিন্তা করিতে হয় না,

[২০] কেহ আবার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া সগর্ব্বে বলিয়াছেন "ভারতে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী, তাঁহারা নারীরই উপাসক।" বেশ !বলি হিন্দুর আরাধ্য দেবতা কোন জিনিষটা নহে? পূজনীয় বস্তু বলিতে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ ইহার কোন পদার্থটিকে বাদ দেওয়া যায়? হনুমান এবং গোজাতিও কি উপাস্য দেবতা নহে? তাই বলিয়া কি ঐ সকল পশুকে তাঁহাদের "উপাসক মানুষ" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে?

সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকদ্দমা করিতে হয় না, চাকরীলাভের জন্য সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে হয় না, "নবাব" "রাজা" উপাধিলাভের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খোসামোদ করিতে হয় না, কিংবা কোন সময়ে দেশরক্ষার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে না। তবে আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা Mental culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental culture) আবশ্যক।

এই যে গৃহিণীদের ঘরকান্নার দৈনিক কার্য্যগুলি, ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্যও ত বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্রী কর্ত্রী ও বিধাত্রী, তাঁহারাই সমাজের গৃহলক্ষ্মী, ভগিনী এবং জননী।

ঘরকন্নার কাজগুলি প্রধানতঃ এই–

(ক) গৃহ এবং গৃহসামগ্রী পরিস্কার ও সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা।
(খ) পরিমিত ব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহস্থালী সম্পন্ন করা।
(গ) রন্ধন ও পরিবেশন।
(ঘ) সূচিকর্ম্ম।
(ঙ) পরিজনদিগকে যত্ন করা।
(চ) সন্তানপালন করা।

এখন দেখা যাউক ঐ কার্য্যগুলি এদেশে কিরূপ হইয়া থাকে এবং কিরূপ হওয়া উচিত। আমরা ধনবান এবং নিঃস্বদিগকে ছাড়িয়া মধ্যম অবস্থার লোকের কথা বলিব।

গৃহখানা পরিস্কার ও অল্পব্যয়ে সুন্দর রূপে সাজাইয়া রাখিতে হইলে বুদ্ধির দরকার। প্রথমে গৃহনির্ম্মাণের সময়ই গৃহিণীকে স্বীয় সলিকা (taste)

দেখাইতে হইবে[২১] কোথায় একটি বাগান হইবে, কোন স্থানে রন্ধনশালা হইবে ইত্যাদি তাঁহারই পসন্দ অনুসারে কোথায় চাই। ভাড়াটে বাড়ী হইলে তাহার কোন কামনা কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে বিষয়ে সলিকা চাই। যেহেতু তিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু বলি, জয় জন গৃহিণীর এ জ্ঞান আছে? আমরা এমন গৃহিণী যে গৃহব্যাপারই বুঝি না! আমাদের বিসমেল্লায়ই গলৎ!!
গৃহনির্ম্মাণের পর গৃহসামগ্রী চাই। তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার জন্যও সলিকা চাই। কোথায় কোন জিনিসটা থাকিলে মানায় ভাল, কোথায় কি মানায় না, এ সব বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। একটা মেয়েলী প্রবাদ আছে, "সেই ধান সেই চাউল গিন্নী গুলে আউল ঝাউল" (এলোমেলো)। ভাঁড়ার ঘরে সচরাচর দেখা যায়, মাকড়সার জাল চাঁদোয়ারূপে শোভা পাইতেছে! তেঁতুলে তণ্ডুলে বেশ মেশামিশী হইয়া আছে, কোথাও ধ'নের সহিত মৌরি পাইতেছে। চিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে এক ঘন্টা সময় লাগে। চারি দিক বদ্ধ থাকে বলিয়া ভাঁড়ার ঘরের দ্বার খোলা মাত্র বদ্ধ বায়ুর এক প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। অভ্যাসের কৃপায় এ দুর্গন্ধ গিন্নিদের অপ্রিয় বোধ হয় না।

অনেক শ্রীমতী পান সাজিতে বসিয়া যাঁতির খোঁজ করেন; যাঁতি পাওয়া গেলে দেখেন পানগুলি ধোওয়া হয় নাই। পানের ডিবে কোন ছেলে কোথায় রাখে তার ঠিক নাই! কখন না খয়ের ও চূণের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুদ পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পান থাকে ঘটিতে, সুপারী থাকে একটা সাজিতে, খয়ের হয়ত থাকে কাপড়ের বাক্সে! অবশ্য "সাহেবে সলিকা" গণ এরূপ করেন না। তাঁহাদের পানের সমস্ত জিনিস যথাস্থানে সুসজ্জিত থাকে।

কেহ বা চা'র পাত্র (tea-port) মৎস্যাধাররূপে ব্যবহার করেন, ময়দা চালিবার চালনীতে পটল, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি কুটিয়া রাখা হয়! পিতলের

---

[২১] উর্দ্দু ভাষায় "সলিকা" manner, taste নিপুণতা যোগ্যতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সলিকা শব্দের ন্যায় মেয়েলী ভাষায় "কাজের ছিরি" কথা চলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সলিকার সমুদয় ভাব প্রকাশ হয় না। তাই সুবিধার নিমিত্ত এ শব্দটাকে বাঙ্গালায় প্রবেশ করাইতে চাই। "আরজী" "তহবিল" "মাহসুল" (মাশুল(ইত্যাদি শব্দ বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। "সলিকা"ও চলুক। "সাহেবে সলিকা" অর্থে যাহারা সলিকা আছে)person of taste) বুঝায়।

বাটীতে তেঁতুলের আচার থাকে! পূর্ব্বে মুসলমানেরা "মোকাবা" (পাত্র বিশেষ, যাহাতে চুল বাঁধিবার সমঞ্জাম থাকে) রাখিতেন, আজিকালি অনেকে toilet table রাখেন। ইহাদের "মোকাবায়" কিংবা টেবিলের উপর চিরুণী তৈল (toilet সামগ্রী) ছাড়া আরও অনেক জিনিষ থাকে, যাহার সহিত কেশবিন্যাস সামগ্রীর (toilet এর) কোন সম্পূর্ণ নাই।

পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগা পুরুষেরা টাকা উপার্জ্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি ঘাম পায় ফেলিয়া এক একটী পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জ্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটুকাটব্য বলিবেন, কিন্তু একটু সহানুভূতি করেন কই? ঐ শ্রমার্জ্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে কেবল সাধ (আমোদ) আহ্লাদে ব্যয় করিবেন, অথবা অলঙ্কার গড়াইতে ঐ টাকা দ্বারা স্বর্ণকারের উদর-পূর্ত্তি করিবেন। স্বামী বেচারা এক সময় চাকরীর আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, বহু আয়াসে সামান্য বেতনে চাকরী প্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নুপুরের বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুণুঝুনু রবে কাঁদিতে থাকে। হায় বালিকে! তোমার চরণশোভন সেই মল গড়াইতে তোমার পিতার হৃদয়ের কতখানি রক্ত শোষিত হইয়াছে তাহা তুমি বুঝ না।

স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করাই অর্থের সদ্ব্যবহার। ইউরোপীয় মহিলাদের কথার মূল্য বেশী, তাই একজন কাউনটেসের (Countess) উক্তি উদ্ধৃত করা গেলঃ

"The first point necessary to consider in the arrangemnet and ordering of a lady's househole, is that everything should be on a scale exactly proportionate to her husband's income."

(ভাবার্থ-বাড়ী ঘর সাজাইবার সময় গৃহিণী সর্ব্বপ্রথমে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন যে তাঁহার গৃহস্থালীর যাবতীয় সামগ্রী যেন তাঁহার স্বামীর আয় অনুসারে প্রস্তুত হয়। তাঁহার গৃহসজ্জা দেখিয়া যেন তাঁহার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ঠিক অনুমান করা যাইতে পারে)।

সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আমরা টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে? গৃহিণীরা যে স্বামীকে ভালবাসেন না, আমি ইহা বলিতেছি না। তাঁহারা স্বামীকে প্রাণের অধিক ভালবাসে, কিন্তু বুদ্ধি না থাকাবশতঃ প্রকৃত সহানুভূতি করিতে পারেন না। কবিবর সাদী বুদ্ধিহীন বন্ধু অপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বাস্তবিক স্ত্রীদের অন্ধপ্রেমে অনেক সময় পুরুষদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট সাধিত হয়।

কেহ আবার পরিমিত ব্যয় করিতে যাইয়া একেবারে কৃপণ হইয়া পড়েন, ইহাও উচিত নহে।

গৃহিণীর রন্ধন শিক্ষা করা উচিত, এ কথা কে অস্বীকার করেন? একটা প্রবাদ আছে যে স্ত্রীদের রান্না তাঁহাদের স্বামীর রুচি অনুসারে হয়। গৃহিণী যে খাদ্য প্রস্তুত করেন; তাহার উপর পরিবারস্থ সকলের জীবনধারণ নির্ভর করে। মূর্খ রাঁধুনীরা প্রায়ই “কালাই”[২২] রহিত তাম্রপাত্রে দধি মিশ্রিত করিয়া যে কোর্ম্মা প্রস্তুত করে, তাহ বিষ ভিন্ন আর কিছু নহে; মুসলমানেরা প্রায়ই অরুচি, ক্ষুদামান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকেন, তাহার কারণ খাদ্যের দোষ ছাড়া আর কি হইতে পারে? এ সম্বন্ধেও সেই কাউনটেসের (Chemistry) উক্তি শুনুন,--

“Bad food, ill-cooded food, monotonous food, insufficient food, injure the physique and ruin the temper. No lady should turn to the more tempting occupations of amusements of the day till she had gone

---

২২ “কালাই” শব্দের বাঙ্গালা কি হইবে? ইংরাজীতে Tinningবলে।

into every detail of the family commissariat and assured herself that it is as good as her purse, her cook, and the season can make it.”

(ভাবার্থ-কোন মহিলাই প্রথমে স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের আহারের সুবন্দোবস্ত এবং রন্ধনশালা পরিদর্শন না করিয়া যেন অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ না করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থানুসারে খাদ্যসামগ্রী যথাসাধ্য সুরুচিকর হইয়া থাকে কি না এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তনের সহিত আহার্য্য বস্তুরও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ভোজ্য দ্রব্য যথাবিধি রন্ধন না হইলে কিম্বা সর্ব্বদা একই প্রকার খাদ্য এবং অখাদ্য ভোজন করিলে শরীর দুর্ব্বল এবং নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে)।

সুতরাং রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর ডাক্তারী ও Chemistry) রসায়ন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন খাদ্যের কি গুণ, বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্যø প্রয়োজন, এ সব বিষয়ে গৃহিণীর জ্ঞান চাই। যদি আহারই যথাবিধি না হয়, তবে শরীরের পুষ্টি হইবে কিসের দ্বারা? অযোগ্য ধাত্রীর হস্তে কেহ সন্তান পালনের ভার দেন না, তদ্রূপ অযোগ্য রাঁধুনীর হাতে খাদ্য দ্রব্যের ভার দেওয়া কি কর্ত্তব্য? রন্ধনশালার চতুর্দ্দিকে কাদা হইলে সেই স্থান হইতে সতত দূষিত বাস্প উঠিতে থাকে; বাড়ীর লোকেরা দুগ্ধ এবং অন্যান্য খাদ্যের সহিত ঐ বাস্প আত্মসাৎ করে। কেবল আহারের স্থান পরিস্কৃত হইলেই চলিবে না; যে স্থানে আহার করা হয় সে জায়গায় বায়ু (Atmosphere) পর্যন্ত যাহাতে পরিস্কৃত থাকে, গৃহিণী সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

অনেকে শাকসবজী খাইতে ভালবাসেন। বাজারের তরকারী অপেক্ষা গৃহজাত তরকারী অবশ্য ভাল হয়। গৃহিণী প্রায়ই শিম, লাউ, শশা, কুস্মণ্ড স্বহস্তে বপন করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা উদ্যান প্রস্তুত প্রণালী (Horticulture) অবগত থাকেন, তবে ঐ লাউ কুমড়ার কি সমধিক উন্নতি হইবে, গৃহিণীর এ জ্ঞানটুকু ত থাকা চাই।

অনেকেই ছাগল, কুক্কুট, হংস, পারাবত ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু সেই সকল জন্তু পালন করিবার রীতি অনেকেই জানেন না। উহাদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থান না থাকায় উহারা বাড়ীর মধ্যেই ঘুরিয়া চরিয়া বেড়ায়। কাজেই বাড়ীখানাকে পশুশালা বা পশুপীদের "ময়লার ঘর" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাতে এই জন্তুগুলি রুগ্ন না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট থাকে এবং গৃহ নোঙ্গরা করিতে না পারে, তৎপ্রতি গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উহাদের বাসস্থানও পরিস্কৃত উবং হাওয়াদার (airy) হওয়া উচিত। নচেৎ রুগ্ন পশুপীর মাংস খাওয়ায় অনিষ্ট বই উপকার নাই। তবেই দেখা যায়, এক রন্ধন শিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্‌ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপ তত্ত্ব (Horticulture, Chemistry ও Theory of heat) শিখিতে হয়!!

অন্নের পরই বস্ত্র-না, মানুষ বস্ত্রকে অন্ন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করে। শীত গ্রীস্মনুযায়ী বস্ত্র, প্রস্তুত কিংবা সেলাই করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে তাঁহারা চরখা কাটিয়া সূতা প্রস্তুত করিতেন। এখন কল কারখানার অনুগ্রহে কাপড় সুলভ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ taste (পসন্দ) অনুসারে সেলাই করিতে হয়। এ জন্যও সুশিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। আপনারা হয়ত মনে করিবেন যে, আমার সব কথাই দৃষ্টিছাড়া। এত কাল হইতে নিরর দরজীরা ভালই সেলাই করিয়া আসিতেছে, সেলাইএর সঙ্গে সুশিক্ষার সম্বন্ধ কি? সেলাইএর সহিত পড়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু আনুষঙ্গিক (indirect) সম্বন্ধ আছে। পড়িতে (বিশেষতঃ ইংরাজী) না জানিলে সেলাইয়ের কল (sewing machine এর) ব্যবস্থাপত্র পাঠ করা যায় না। ব্যবস্থা না বুঝিলে মেশিন (machine) দ্বারা ভাল সেলাই করা যায় না। কেবল হাতে সেলাই করিলে লেখা পড়া শিখিতে হয় না, সত্য। কিন্তু হাতের সেলাইএর সহিত মেশিনএর সেলাইয়ের তুলনা করিয়া দেখিবেন ত কোনটি শ্রেষ্ঠ? তাহা ছাড়া মেশিন দ্বারা অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে অধিক সেলাই হয়। অতএব মেশিন চালনা শিক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। এতদ্ব্যতীত ক্যানভাস (Canvas) এর জুতা, পশমের মোজা, শাল প্রভৃতি কে না ব্যবহার করিতে চাহেন? এই প্রকারের সূচিকার্য ইংরাজী (knitting ও Crochet সম্বন্ধীয়) ব্যবস্থাপত্রের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে হয় না। ঐ ব্যবস্থাপুস্তকপাঠে শিয়িত্রীর কাট সাহায্যে সূচিকর্ম্মে সুনিপুণা হওয়া যায়; কাপড়ের ছাঁট কাট

সবই উৎকৃষ্ট হয়। কাপড়ের কাট ছাঁটের জন্যও ত বুদ্ধির দরকার। কাপড়, পশম, জুতা ইত্যাদির পরিমাণ জানা থাকিলে, একজোড়া মোজার জন্য তিন জোড়ার পশম কিনিয়া অনর্থক অপব্যয় করিতেও হয় না।

পরিবারভুক্ত লোকদের সেবা যত্ন করা গৃহিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেকের সুখ সুবিধার নিমিত্ত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করা রমণীজীবনের ধর্ম্ম। এ কার্য্যের জন্যও সুশিক্ষা (training) চাই। সচরাচর গৃহিণীরা পরিজনকে সুখ দিবেন ত দূরের কথা, তাঁহাদের সহিত ছোট ছোট বিষয় লইয়া কোঁদল কলহে সময় কাটাইয়া থাকেন। শাশুড়ীর নিন্দা ননদিনীর নিকট, আবার ননদের কুৎসা মাতার নিকট করেন, এইভাবে দিন যায়।

কেহ পীড়িত হইলে তাহার যথোচিত সেবা করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য, রোগীর সেবা অতি গুরুতর কার্য্য। যথারীতি শুশ্রূষা-প্রণালী (nursing) অবগত না হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগী ঔষধ পথ্যের অভাব না হইলেও শুশ্রূষার অভাবে মারা যায়। অনেক স্থানে নিরর সেবিকা রোগীকে মালিশের ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। কেহ বা অসাবধনতাবশঃ বিষাক্ত ঔষধ যেখানে সেখানে রাখে, তাহাতে অবোধ শিশুরা সেই ঔষধ খাইয়া ফেলে। এইরূপ ভ্রমের জন্য চিরজীবন অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। কেহ বা রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া পথ্য দান করে, কেহ অধ্যধিক স্নেহবশতঃ তিন চারি বারের ঔষধ একবারে সেবন করায়। এরূপ ঘটনা এদেশে বিরল নহে। ডাক্তারী বিষয়ে সেবিকার উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক, একথা কেহ অস্বীকার করেন কি? ডাক্তারী না জানিয়া শুশ্রূষা করিতে যাওয়া যা, আর স্বর্ণকারের কাজ শিখিয়া চর্ম্মকারের কাজ করিতে যাওয়াও তাই!

কিন্তু ডাক্তারী জান বা জান, রোগীর সেবা সকলকেই করিতে হয়। এমন দুহিতা কে আছেন, যিনি অশ্রুধারায় জননীর পদ প্রক্ষালন করিতে করিতে ভাবেন না যে "এত যত্ন পরিশ্রম সব ব্যর্থ হ'ল; আমার নিজের পরমায়ুঃ দিয়াও যদি মাকে বাঁচাইতে পারিতাম। এমন ভগিনী কে আছেন, যিনি পীড়িত ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া অনাহারে দিন যাপন করেন না? এমন পত্নী কে, যিনি স্বামীর পীড়ার জন্য ভাবিয়া নিজে আধমরা হন না? এমন জননী কে আছেন, যিনি জীবনে কখনও পীড়িত শিশু কোলে লইয়া অনিদ্রায় রজনী যাপন করেন

নাই? যিনি কখনও এরূপ রোগীর সেবা করেন নাই, তিনি প্রেম শিখেন নাই। না কাঁদিলে প্রেম শিক্ষা হয় না।

বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রক্ষা করা অতি আবশ্যক। এই গুণটা আমাদের অনেকেরই নাই। আমরা কেবল হায়! হায়! করিয়া কাঁদিতে জানি! বোধ হয় আশা থাকে যে, অবলার চক্ষের জলে দেখিয়া শমনদের সদয় হইবেন! অনেক সময় দেখা যায় রোগী এ দিকে পিপাসায় ছটফট করিতেছেন, সেবিকা ওদিকে বিলাপ করিয়া (নানা ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া) কাঁদিতেছেন! হায় সেবিকে, এ সময় রোগীর মুখে কি একটু দুধ দেওয়ার দরকার ছিল না? এ সময়টুকু যে দুধ না খাওয়াইয়া রোদনে অপব্যয়িত হইল, ইহার ফলে রোগীর অবস্থা বেশী মন্দ হইল।

এ স্থলে পতিপ্রাণা গৃহিণীর কথা মনে পড়িল। একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বামীদেবের বুকে ব্যথা হইয়াছিল; সেজন্য তিনি দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছিলেন। পরদিন প্রভাতে কবিরাজ আসিয়া বলেন, “এখন অবস্থা মন্দ, রাত্রেই বুকে একটুকু সর্ষের তৈল মালিশ করিলে এরূপ হইত না।” গৃহিণী অনিদ্রায় নিশি যাপন করিলেন, একটু তৈলমর্দ্দণ করিলেন না। কারণ এ জ্ঞানটুকু তাঁহার ছিল না। ঐ অজ্ঞানতার ফলে ত্রিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইল, (১) স্বামীর স্বাস্থ্য বেশী খারাপ হইল; (২) নিজে অনর্থক রাত্রিজাগরণে অসুস্থ হইলেন; (৩) চিকিৎসকের জন্য টাকার অপব্যয় হইল। কারণ রাত্রে তৈল মাখিলেই ব্যথা সরিয়া যাইত, চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইত না।

এখন যদি আমি বলি যে, গৃহিণীদের জন্য একটা “জেনানা মেডিকেল কলেজ” চাই, তবে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সন্তানপালন।-ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। সন্তানপালনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের শিক্ষা হইয়া থাকে। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, “মাতা হইবার পূর্ব্বেই সন্তানপালন শিক্ষা করা উচিত। মাতৃকর্ত্তব্য অবগত না হইয়া যেন কেহ মাতা না হয়।” যে বেচারীকে ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমে মাতা, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মাতামহী এবং চল্লিশ বৎসরে প্রমাতামহী হইতে হয়, সে মাতৃজীবনের কর্ত্তব্য কখন শিখিবে?

শিশু মাতার রোগ, দোষ, গুণ, সংস্কার সকল বিষয়েরই উত্তরাধিকারী হয়। ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। অবশ্য অনেক স্থলে সুমাতার কুপুত্র অথবা কুমাতারও সুপুত্র হয়, বিশেষ কোন কারণে ওরূপ হয়। স্বভাবতঃ দেখা যায় আতার গাছে আতাই ফলে, জাম ফলে না। শিশু স্বভাবতঃ মাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, তাঁহার কথা সহজে বিশ্বাস করে। মাতার প্রতিকার্য্য, প্রতিকণা শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রতি ফোঁটা দুগ্ধের সহিত মাতার মনোগত ভাব শিশুর মনে প্রবেশ করে। কবি কি চমৎকার ভাষায় বলিতেছেনঃ

"-দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি,
বীরগুণগাথা বিক্রমকাহিনী,
বীরগর্ব্বে তার নাচুক ধমনী।"

তাই বটে, বীরাঙ্গনাই বীর-জননী হয়! মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারে। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ, জুয়াচোর হয়। অযোগ্য মাতা কারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে, ভবিষ্যতে তাহারা শ্বেতাঙ্গের অর্দ্ধচন্দ্র ও সবুট পদাঘাতা নীরবে-অকেশে সহ্য করে। কোন মজুরের পৃষ্ঠে জনৈক গৌরাঙ্গ নূতন পাদুকা ভাঙ্গিয়া ভগ্ন জুতার মূল্য আদায় না করায় সেই কূলি, "নৌতুন জুতা মারলো-দামডী লইল না" বলিয়া সাহেবের প্রশংসা করিয়াছিল! বলা বাহুল্য যে, অনেক "ভদ্রলোকের" অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অতএব সন্তানপালনের নিমিত্ত বিদ্যা বুদ্ধি চাই, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিয়িত্রী। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে হইলে প্রথমে মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে।

কেবল কাজ লইয়াই ১৬/১৭ ঘন্টা সময় কাটান কষ্টকর। মাঝে মাঝে বিশ্রামও চাই। সেই অবসর সময়টুকু পরনিন্দায়, বৃথা কোঁদলে কিংবা তাস

খেলায় না কাটাইয়া নির্দ্দোষ আমোদে কাটাইলে ভাল হয় না কি? সে জন্য চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। যিনি এ বিষয়ে পারদর্শিতা হইতে চাহেন, তাঁহাকেও বর্ণমালার সহিত পরিচয় করিতে হইবে। চিত্রের বর্ণ, তুলির, বর্ণনা, সঙ্গীতের স্বরলিপি সবই পুস্তকে আবদ্ধ অথবা সুপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে কিংবা কবিতা প্রভৃতি রচনায় অবসর সময় যাপন করা শ্রেয়ঃ।

প্রতিবেশীর প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। অতিথি সৎকার ও প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য এক কালে আরব জাতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে আরবীয় কোন ভদ্রলোকের আবাসে ইঁদুরের বড় উৎপাত ছিল। তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বিড়াল পুষিতে উপদেশ দেওয়ায় তিনি বলিলেন যে বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরগুলি তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার প্রতিবেশীদিগকে উৎপীড়ন করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি বিড়াল পোষেন না।

আর আমরা শুধু নিজের সুখ সুবিধার চিন্তায় ব্যস্ত থাকি, অপরের অসুবিধার বিষয় আমাদের মনে উদয়ই হয় না। বরং কাহারও বিপদের দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে কি না, সেই কথাই পূর্ব্বে মনে উদয় হয়! কেহ দুঃসময়ে কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ক্রেতা ভাব্বেন এই সুযোগে জিনিষটি বেশ সুলভ পাওয়া যাইবে! ঈদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে দৃষ্টি রাখা শিক্ষিত সমাজের শোভা পায় না। অথবা এক জনে হয়ত ক্ষণিক ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ভাল চাকরাণীটাকে বিদায় দিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ অপর একজন গৃহিণী সেই বিতাড়িতা চাকরাণীকে হাত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আদর্শ গৃহিণী সে স্থলে সেই পরিচারিকাকে পুনরায় তাহার প্রভুর বাড়ী নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন। প্রতিবেশীর বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করা উচিত।

আর প্রতিবেশীর পরিধি বৃহৎ হওয়া চাই-অর্থাৎ প্রতিবেশী বলিলে যেন কেবল আমাদের দ্বারস্থিত গৃহস্থ না বুঝায়। বঙ্গদেশের প্রতিবেশী বলিতে পাঞ্জাব, অযোধ্যা; উড়িষ্যা-এসবই যেন বুঝায়। হইতে পারে পাঞ্জাবের একদল ভদ্রলোক কোন কারখানায় কাজ করেন; সেই কারখানার কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহারা বিশেষ কোন অভাবে বিষয় জানাইতে বারম্বার চেষ্টা করিয়া

অকৃতকার্য্য হওয়ায় ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ ধর্ম্মঘটকে যেন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজের লোকে নিজেদের কার্য্য প্রাপ্তির সুযোগ ভাবিয়া আহ্লাদিত না হন। সুগৃহিণী আপন পতি পুত্রকে তাদৃশ ধর্ম্মঘট স্থলে কার্য্য গ্রহণে বাধা দিলেন। আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা পারসী বা খ্রীষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি-আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসী তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেবভবন সদৃশ ও পরিজন দেবতুল্য হইবে। এমন ভারতমহিলা কে, যিনি আপন ভবনকে আদর্শ দেবালয় করিতে না চাহিবেন?

দরিদ্রা প্রতিবেশিনীদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করাও আমাদের অন্যতম কর্ত্তব্য। তাহাদের সূচিশিল্প এবং চরকায় প্রস্তুত সূত্রের বস্ত্রাদি উচিত মূল্যে ক্রয় করিতে তাহাদের পরম উপকার করা হয়। এইরূপে এবং আরও অনেক প্রকার তাহাদের সাহায্য করা যাইতে পারে; বিস্তারিত বলা বাহুল্য মাত্র।

আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বালক বালিকাদিগকে ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর দেখা যায়, বড় ঘরের বালকেরা ভারী দাম্ভিক হয়, তাহারা চাকরকে নিতান্ত নগণ্য কি যেন কি মনে করে। বেতনভোগী হইলেই ভৃত্যবর্গ যে মানুষ এবং তাহাদেরও স্বীয় পদানুসারে মান অপমান জ্ঞান আছে, সুকুমারমতি শিশুদিগকে একথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অনেক গৃহিণী নিজের পুত্রকন্যার দোষ বুঝেন না, তাঁহারা চাকরকেই অযথা শাসন করেন। ওরূপে শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়।

উর্দ্দু "বানাতননাশ" গ্রন্থে বর্ণিত নবাবনন্দিনী হোসনে-আরা অন্যায় আদরে এমন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার দৌরাত্মে দাসী, পাচিকা

প্রভৃতি সেবিকাবৃন্দ ত্রাহি ত্রহি করিত!"[২৩] যাহাতে বালিকারা বিনয়ী এবং শিষ্ট শান্ত হয়, এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

---

[২৩] হোসেন-আরার বাল-সুলভ ঔদ্ধত্যের বর্ণনা বেশ আমোদপ্রদ। পাঠিকাদিগকে একটু নমুনা উপহার দিইঃ হোসেন-আরা, পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী-কাহাকেই ভয় করিত না। সমস্ত বাড়ি সে মাথায় তুলিয়া রাখিত! একদিন তাহার বড় মাসী শাহজামানী বেগম তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন। পরিচারিকার দল হয় ত ভাবিল, ছোট বেগমের (হোসেন-আরার মাতার) নিকট অভিযোগ বিশেষ কোন ফল হয় না; বড় বেগম নবাগতা, ইহাকে দেখিয়া হোসেন-আরার চপলতা কিঞ্চিৎ দমিয়া যাইবে। শাহজামানী বেগম শিবিকা হইতে অবতরণ করিবা মাত্র ক্রমান্বয়ে দুই চারি অভিযোগ উপস্থিত হইল।

নরগেস কাঁদিয়া আসিয়া বলিল, "দেখুন, ছোট সাহেবজাদী (হোসেন-আরা) এমন পাথর ছুড়িয়া মারিয়াছেন ভাগ্যক্রমে আমার চক্ষু নষ্ট হয় নাই।"

সোসন আসিয়া বলিল, "দেখুন, ছোট সাহেবজাদী আমায় বলিলেন, 'দেখি সোসন তোর জিহবা,' যেই আমি জিহবা বাহির করিলাম অমনি তিনি আমার চিবুকে এমন জোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে আমার সমস্ত দাঁত রসনায় বিদ্ধ হইয়াছিল!"

গোলাপ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "হায়! আমার কাণ রক্তাক্ত করিয়া দিলেন!"

রন্ধনশালা হইতে পাচিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এই দেখুন ছোট সাহেবজাদী তরকারির হাঁড়িতে মুঠা ভরিয়া ছাই দিতেছেন!"

ঐ সব শুনিয়া বড় বেগম ডাকিলেন, "হোসনা! এখানে আইস!" হোসনা তৎক্ষণাৎ আসিল ত; কিন্তু আসিয়া, মাসীকে নমস্কার করিবে ত দূরের কথা,-হাতে ছাই পায় কাদা-এই অবস্থায় সে হঠাৎ মাসীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তিনি সাদরে বলিলেন, "হোসনা! তুমি বড় দুষ্ট হইয়াছ।"

হোসনা তখন উপস্থিত দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই সম্বেল পেত্নী বুঝি কোন কথা আপনাকে লাগাইয়াছে?" এই বলিয়াই সে মাসীর ক্রোড় হইতে লাফাইয়া উঠিয়া নির্দ্দোষ সম্বেলের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার আরম্ভ করিল! "আঁ! ও কি কর! কি কর!" বলিয়া বড় বেগম বারম্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না।

পরে হোসেন-আর জেনানা মকতবে (পাঠশালায়) প্রেরিত হইয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্বারা লেখক মহোদয় দেখাইয়াছেন যে অমন অবাধ্য অনম্য বালিকাও শিক্ষার গুণে ভাল হয়।

পরিশেষে বলি প্রেমিক হও, ধার্ম্মিক হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও, তাহাতেই মানসিক উন্নতির (mental culture এর) প্রয়োজন। প্রেমিক হইতে গেলে নির্ভর ন্যায়পরতা, মাশুকের![২৪] নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন ইত্যাদি শিণীয়। নতুবা নির্ব্বোধ বন্ধু হইলে কাহারই উপকার করিতে পারিবে না। ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন, কারণ "কে বে-ইলমে না তওয়াঁ খোদারা শেনাখত"। অর্থাৎ জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরকে চেনা যায় না! অন্যত্র প্রবাদ আছে "মূর্খের উপাসনা ও বিদ্বানের শয়নাবস্থা সমান"। অতত্রব দেখা যায় যে, রমণীর জন্য আজ পর্য্যন্ত যে সব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে, তাহা সাধন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন। অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত পুরুষদের যেমন মানসিক শিক্ষা (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালীর জন্য গৃহিণীদেরও তদ্রূপ মানসিক শিক্ষা (mental culture) প্রয়োজনীয়।

ইতর শ্রেণীর লোকদের মত যেমন-তেমন ভাবে গৃহস্থালী করিলেও সংসার চলে বটে, কিন্তু সেরূপ গৃহিণীকে সুগৃহিণী বলা যায় না; এবং ঐ সব ডোম চামারের পুত্রগণ যে কালে "বিদ্যাসাগর" "বিদ্যাভূষণ" বা "তর্কালঙ্কার" হইবে এরূপ আশাও বোধ হয় কেহ করেন না।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এখন সাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করা আপনাদের কর্ত্তব্য। যদি সুগৃহিণী হওয়া আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রীলোকের জন্য সুশিক্ষার আয়োজন করিবেন।

আমাদের বিশ্বাস সুশিক্ষা স্পর্শমণি যাহাকে স্পর্শ করে সেই সুবর্ণ হয়।

[২৪] "মাশুক"- যাহাকে ভালবাসা যায়; beloved object·

আমি অনেক বার শুনিয়াছি যে আমাদের "জঘন্য অবরোধ প্রথা"ই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে "বোরকা" ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিষটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে কি বুঝিব যে জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছি।

আমাদের ত বিশ্বাস যে অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নাই। উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই। কেহ কেহ বলেন যে ঐ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইলে এফ, এ, বি,এ পরীক্ষার জন্য পর্দা ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে university hall-এ) উপস্থিত হইতে হইবে। এ যুক্তি মন্দ নহে! কেন? আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (university) হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব? যতদিন এইরুপ বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন আমাদের পাশকরা বিদ্যা না হইলেও চলিবে।

অবরোধ প্রথা স্বাভাবিক নহে-নৈতিক। কেননা পশুদের মধ্যে এ নিয়ম নাই। মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া অনেক অস্বাভাবিক কাজ করিতে শিখিয়াছে। যথা- পদব্রজে ভ্রমণ করা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের সুবিদার জন্য গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি নানাপ্রকার যানবাহন প্রস্তুত করিয়াছে। সাঁতার দিয়া জলাশয় পার হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষে নানাবিধ জলযান প্রস্তুত করিয়াছে।- তাহার সাহায্যে সাঁতার না জানিলেও অনায়াসে সমুদ্র পার হওয়া যায়। ঐরুপ মানুষের "অস্বাভাবিক" সভ্যতার ফলেই অন্তঃপুরের সৃষ্টি। পৃথিবীর অসভ্য জাতীরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। ইতিহাসে জানা যায়, পূর্বের অসভ্য ব্রিটনেরা অর্দ্ধনগ্ন থাকিত। ঐ অর্দ্ধনগ্ন অবস্থার পূর্বের গায় রঙ মাখিত! ক্রমে সভ্য হইয়া তাহারা পোষাক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

এখন সভ্যতাভিমানিনী (civilized) ইউরোপীয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নীগণ মুখ ব্যতিত সর্ব্বঙ্গ আবৃত করিয়া হাটে মাঠে বাহির হন। আর অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা (ঘরের বাহির হইবার সময়) মহিলাদের মুখের উপর আরও একখন্ড বস্ত্রাবরন (বোরকা) দিয়া ঐ অঙ্গাবরণকে সম্পূর্ণ উন্নত (perfect) করিয়াছেন। যাঁহারা বোরকা ব্যবহার করেন না, তাঁহারা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকেন।

কেহ কেহ বোরকা ভারী বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে ইংরেজ মহিলাদের প্রকান্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারী নহে।

পর্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন করা বা হওয়া, শরীর ঢাকা ইত্যাদি- কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই " বে-পর্দা" বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমতে পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়।

বর্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন; তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে? তাঁহাদের শয়নকক্ষে, এমনকি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেন না। এ প্রথা কি দোষণীয়? অবশ্য নহে। কিন্তু এদেশের যে ভগ্নীরা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের না আছে ইউরোপীয়দের মত শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র্য (bedroom privacy) না আছে আমাদের মত বোরকা!

এমন পবিত্র অবরোধ- প্রথাকে যিনি "জঘন্য" বলেন, তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম। সভ্যতা (civilization)ই জগতে পর্দা বৃদ্ধি করিতেছে! যেমন পূর্বের লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্য (civilized) লোকে চিঠির উপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকে না; অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকে খাদ্যসামগ্রীর তিন চারি পাত্র একখানা বড় থালায় (tray-তে) রাখিয়া উপরে একটা "খানপোষ" বা "সরপোষ" ঢাকা দেন; যাঁহারা আরও বেশী সভ্য তাঁহাদের খাদ্য বস্তুর

প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র আবরণ থাকে। এইরুপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি।

আজিকালি যে সকল ভগ্নী নগ্নপদে বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদেরই আত্মীয়া সুশিক্ষিতা (enlightened) ভগ্নীগণ আবার সভ্যতার পরিচায়ক মোজা জুতার ভিতর পদযুগল আবৃত করেন। ক্রমে হাত ঢাকিবার জন্য দস্তানার সৃষ্টি হইয়াছে। তবেই দেখা যায়- সভ্যতার (civilization-এর)সহিত অবরোধ প্রথার বিরোধ নাই।

তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এদেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন! কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এই ভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। যেহেতু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না, তবে শিখিবে কাহার নিকট? নববধূদের অন্যায় পর্দার উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিবাহের পর প্রথম দুই চারি মাস কেবল "জড় পুত্তলিকা" সাজিয়া থাকিতে বাধ্য হন! এরুপ কৃত্রিম অন্ধ ও বোবা হইয়া থাকায় কেমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা যে সশরীরে ভোগ করে, সেই জানে!! কথিত আছে, কোন যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন! তৃতীয় দিবস "চৌথী" ও স্নানের সময় অন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পৃষ্ঠের ক্ষত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিল! আজিকালি বৃদ্ধাগণ খুব প্রশংসার সহিত ঐ বধূটির উপমা দিয়া থাকেন! বোধ হয় বৃশ্চিকটা খুব বিষাক্ত ছিল না!

যাহা হউক ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে। অনেক পরিবারে মহিলাগণ ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ব্যতীত অপর কাহারও বাটী যাতায়াত করেন না। ইহাতে পাঁচ রকমের স্ত্রীলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা একবারে কূপমন্ডুক হইয়া থাকেন। অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখা শুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর

লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদেরও তদ্রুপ করা উচিত। অবশ্য যাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র- শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাঁহাদের সঙ্গে মিশিবে, - তাঁহারা যে কোন ধর্মাবলম্বিনী (য়িহুদী, নাসারা, বুৎপরস্ত বা যা'ই) হউন, ক্ষতি নাই। এই যে "গয়ের মজহব" বিমিষ্ট স্ত্রীলোকের সহিত পর্দা করা হয়, ইহা ছাড়িতে হইবে। আমাদের ধর্ম ত ভঙ্গপ্রবণ নহে, তবে অন্য ধর্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইলে ধর্ম নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরার কোন অসুবিধা হয় না। তবে সে জন্য সামান্য রকমের একটু অভ্যাস (practice) চাই; বিনা অভ্যাসে কোন কাজটা হয়?

শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি ইতঃপূর্বেরও বলিয়াছি যে "নর ও নারী উভয়ে মিলিয়ে একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না" এখনও তাহাই বলি। এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।

এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই- তাঁহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান- ভূষণে অলকৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএত শরীর- শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্জনীয়। এ অমূল্য অলঙ্কার:

“চোরে নাহি নিতে পারে করিয়া হরণ,
জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বন্টন,
দান কৈলে ক্ষয় নাহি কয় কদাচন,
এ কারণে বলে লোকে বিদ্যা মহাধন।”

আমি আরো দুই চারি পংক্তি বাড়াইয়া বলি:

অনলে না পারে ইহা করিতে দহন,
সলিলে না পারে ইহা করিতে মগন,
অনন্ত অক্ষয় ইহা অমূল্য রতন,--
এই ভূষা সংঙ্গে থাকে যাবত জীবন!

তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা “জেনানা স্কুলের” আয়োজন করা হউক। কিন্তু ভগ্নীগণ যে স্কুল লাভের জন্য সহজে গহনা ত্যাগ করিবেন, এরুপ ভরসা হয় না। দুঃখের কথা কি বলিব,- আমার ভগ্নীদিগকে বোধ হয় এক প্রকার গৃহ- সামগ্রীর মধ্যে গণনা করা হয়! তাই টেবিলটা যেমন ফুল পাতা দিয়া সাজান হয়; জানালার পর্দাটা যেমন ফুলের মালা, পুঁতির মালা বা তদ্রুপ অন্য কিছু দ্বারা সাজান হয়, সেইরুপ গৃহিণী আপন পুত্র- বধূটিকেও একরাশি অলঙ্কার দ্বারা সাজান আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন! সময় সময় ভ্রাতাগণ আমাদিগকে "সোণা-রুপা রাখিবার স্তম্ভ (stand) বিশেষ" বলিয়া বিদ্রুপ করিতেও ছাড়েন না! কিন্তু "চোরা না শুনে ধরম কাহিনী"!

যাহা হউক, পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব আছে। এই অভাবটি পূরণ হইলে এবং স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ হইলে যথাবিধি পর্দা রক্ষা করিয়াও উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে।

প্রয়োজনীয় পর্দা কম করিয়া কোন মুসলমানই বোধ হয় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন না।[২৫]

আশা করি, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তা ভগ্নীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।

নবনূর
বৈশাখ ১৩১১

---

[২৫]এই সন্দর্ভটি লিখিত হইবার পর বর্ত্তমান ছোটলাট Sir Andrew Fraser এর "The purdah of ignorance" শীর্ষক বক্তৃতার অংশবিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বলিয়াছেন- "Let the efforts of educationists be first directed to be instruction of our girls within the purdah, and let women begin to exercise her chastening influence on society in spite of the system of seclusion, which only time can modify and violent efforts to shake which can only arouse opposition to female education, instead of doing any immediate practical good in the direction, of emancipation of women. (গত ৮ই মার্চ্চের "Telegraph" হইতে উদ্ধৃত হইল।)
আমাদের মতের সহিত ছোলাট বাহাদুরের মতের কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

গৃহ

গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়-যেখানে দিবাশেষে গৃহী কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। গৃহ গৃহীকে রৌদ্র বৃষ্টি হিম হইতে রক্ষা করে। পশু পক্ষীদেরও গৃহ আছে। তাহারাও স্ব স্ব গৃহে আপনাকে নিরাপদ মনে করে। ইংরাজ কবি মনের আবেগে গাহিয়াছেন:

> "Home, sweet home;
> There is no place like home.
> Sweet sweet home."

পিপাসা না থাকিলে জল যেমন উপাদেয় বোধ হয় না, সম্ভবতঃ সেইরূপ গৃহ ছাড়িয়া কতকদিন বিদেশে না থাকিলে গৃহসুখ মিষ্ট বোধ হয় না। বিরহ না হইলে মিলনে সুখ নাই। পুরুষেরা যদিও সর্ব্বদা বিদেশে যায় না, তবু সমস্ত দিন বাহিরে সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য উৎসুক হয়-বাড়ী আসিলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

আবাস বিশ্লেষণ করিলে দুই অংশ দেখা যায়--এক অংশ আশ্রয়স্থান, অপরাংশ পারিবারিক জীবন (অর্থাৎ Home) গৃহরচনা স্বাভাবিক; বিহগ বিহগী পরস্পরে মিলিয়া নীড় নির্ম্মাণ করে, শৃগালেরও বাসযোগ্য গর্ত্ত প্রস্তুত হয়। ঐ নিলয় ও গর্ত্তকে আলয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত গৃহ নয়। সে যাহা হউক,--পশুদের গৃহ আছে কি না এ স্থলে তাহা আলোচ্য নয়।

এখন আমাদের গৃহ সম্মন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাটীকে আপন

ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবনে যে সুখী নহে, যে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য (member) বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে, তাহার নিকট গৃহ শান্তি নিকেতন বোধ হইতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা--সকল শ্রেণীর অবলার অবস্থানই শোচনীয়। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি অন্তঃপুরের একটু একটু নমুনা দিতেছি। এরূপে অন্তঃপুরের পর্দা উঠাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখাইলে আমার ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি-নালীঘায় অস্ত্র চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন! ইহাতে রোগীর অতীব যন্ত্রণা হইলেও তাহা রোগীর সহ্য করা উচিত। উপরের চর্ম্মাবরণ খানিকটা না কাটিলে ভিতরের ক্ষত দেখাইব কিরূপে? তাই ভ্রাতাদের নিকট অন্তঃপুরের কোন কোন অংশের পর্দা তুলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমি ইহা বলি না, যে আমাদের সমাজের গুণ মোটেই নাই। গুণ অনেক আছে, দোষও বিস্তর আছে। মনে করুন, একজনের এক হাত ভাল আছে, অন্য হাতে নালীঘা হইয়াছে। এক হাত ভাল আছে বলিয়া কি অন্য হাতের চিকিৎসা করা উচিত নহে? চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক।

অদ্য আমরা সমাজ-অঙ্গের ক্ষত স্থলের আলোচনা করিব। সমাজের সুস্থ্য অংশ নিশ্চিন্ত থাকুক। আমাদের সমাজে অনেক সুখী পরিবার আছেন, তাঁহাদের বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে। তাঁহারা সুখে শান্তিতে ঘুমাইতে থাকুন। আসুন পাঠিকা! আমরা লৌহপ্রাচীর-বেষ্টিত অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষগুলি পরিদর্শন কির।

১। বলিয়াছি ত কখন বিদেশে না গেলে গৃহ-আগমন সুখ অনুভব করা যায়। আমরা একবার (বেহারে) জামালপুরের নিকটবর্ত্তী কোন সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের জনৈক বন্ধুর বাড়ী আছে। সে বাটীর পুরুষের সহিত আমাদের আত্মীয় পুরুষদের বন্ধুত্ব আছে বলিয়া

শরাফত[২৬] উকিলের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে আমাদের আগ্রহ হয়। দেখিলাম, মহিলাকয়টি অতিশয় শান্ত শিষ্ট মিষ্টভাষিণী, যদিও কূপমণ্ডূক! তাঁহারা আমাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে শরাফতের পত্নী হসিনা, ভগ্নী জমিলা, জমিলার কন্যা ও পুত্রবধু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর জমিলাকে যখন আমাদের বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলাম, তখন তিনি বলিলেন যে তাঁহারা কোন কালে বাড়ীর বাহির হন না, ইহাই তাঁহাদের বংশগৌরব! কখনও ঘোড়ার গাড়ী বা অন্য কোন যানবাহনে আরোহণ করেন নাই। শিবিকা আরোহণের কথায় হ্যাঁ কি না বলিয়াছিলেন, তাহা আমার ঠিক মনে নাই! আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, তবে আপনারা বিবাহ করিয়া শ্বশুরবাড়ী যান কিরূপে? আপনার ভ্রাতৃবধু আসিলেন কি করিয়া? জমিলা উত্তর দিলেন, ইনি আমাদের আত্মীয়-কন্যা-এ পাড়ায় কেবল আমাদেরই গোষ্ঠীর বাড়ী পাশাপাশি দেখিবে।” এই বলিয়া তিনি আমাকে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, এই আমার কন্যার বাড়ী; এখন আমার বাড়ী চল।” তিনি আমাকে একটা অপ্রশস্ত গলির (ইহার একদিকে ঘরবাড়ী, অন্যদিকে উচ্চ প্রাচীর) ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার সকলগুলি কক্ষ দেখাইলেন। কক্ষগুলি “অসুর্য্যস্পশ্য” বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর একটি দ্বার খুলিলে দেখিলাম অপরদিকে হসিনার পুত্রবধু আছে!--জমিলা বলিলেন, “দেখিলে, এই দ্বারের ওপার্শ্বে আমার ভাই এর বাড়ী, এ পার্শ্বে আমার বাড়ী। ও কক্ষে বধূ থাকেন বলিয়া এ দ্বারটি বন্ধ রাখি। আমাদের সওয়ারীর দরকার হয় না কেন, তাহা এখন বুলিলে?” ঐরূপে সকল বাড়ীই প্রদক্ষিণ করা যায়। সমস্ত মহাল্লাটা পর্য্যটন করা আমার অভিপ্রেত না থাকায় আমরা গৃহতুল্য বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। জমিলা বলিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই মক্কা শরীফ যাইবেন,--এ পাপদেশে তাঁহার আর থাকিবার ইচ্ছা নাই! আমরা আশা করি, তিনি মক্কা শরীফ হইতে ফিরিয়া আসিলে গ্রহ-আগমন সুখটা অনুভব করিবেন।

---

[২৬] এ প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নামগুলি কল্পিত। বর্ণনার সুবিধার নিমিত্ত এরূপ নাম দেওয়া হইলো।

পাঠিকা কি মনে করেন যে হসিনা বা জমিলা গৃহে আছেন? অবশ্য না; কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না। এদেশে বাসরঘরকে "কোহ্বর" বলে, কিন্তু "কবর" বলা উচিত!! বাড়ীখানা ত শরাফতের, সেখানে যেমন এক পাল ছাগল আছে, হংস কুক্কুট আছে, সেইরূপ একদল স্ত্রীলোকও আছেন! অথবা স্ত্রীলোকদের "বন্দিনী" বলা যাইতে পারে! যেহেতু তাঁহাদের পারিবারিক জীবন নাই! আপনার নিজের বাড়ীর কথা মনে করুন! তাহা হইরে হসিনার অবস্থা বুঝিবেন।

২। অনেক পরিবারের গৃহিণীদের সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে- "বাহার মিয়া হফত হাজারী, ঘরমেঁ বিবি কাহাৎ কি মারী।" অর্থাৎ, বাহিরে ত যথেষ্ট জাঁকজমক-যেন স্বামী সাতহাজার সেনার অধিনায়ক; আর অন্তঃপুরে গৃহিণী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতা!! বাহিরে বৈঠকখানা আছে, আস্তাবল আছে-অনেক কিছু আছে, আর ভিতরে গৃহিণীর নমাজের উপযুক্ত স্থান নাই!

৩। এখন আমরা অন্তঃপুরের ক্ষতস্থল দেখাইব। সাধারণতঃ পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন গৃহখানা কেবল "আমার বাটী"-পরিবারস্থ অন্যান্য লোকেরা তাঁহার আশ্রিতা।[২৭] মালদহে কয়েকবার আমরা একজনের বাটীতে যাতায়াত করিয়াছি। গৃহস্বামী কলিমের স্ত্রীকে আমরা কখনও প্রফুল্লমুখী দেখি নাই। তাঁহার ম্লান মুখখানি নীরবে আমাদের আন্তরিক সহানুভুতি আকর্ষণ করিত। ইহার কারণ এই--কয় বৎসর অতীত হইল, কলিম স্বীয় ভায়রাভাইয়ের সহিত বিবাদ করিয়াছেন; তাহার ফলে কলিমের পত্নী স্বীয় ভগ্নীর সহিত দেখা করিতে পান না! তিনি এতটুকু ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, "আমার ভগ্নী আমার নিকট অবশ্য আসিবেন।" হায়! বাটী যে কলিমের! তিনি যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন, যাহাকে ইচ্ছা আসিতে

---

[২৭] কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ কোন ঘটনা আমাদের লক্ষ্য নহে। এদিক ওদিককার সত্য ঘটনাসমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটা সাধারণ চিত্র অঙ্কিত হইল মাত। ইহাতে কোন নদীর একধারে নবমুকুলিত আম্রকানন, অন্য তীরে (আমেরিকার) নায়েগারা ফল্সএর তটস্থিত নীহারাবৃত পত্রহীন তরুরাজি দেখিয়া কেহ চিত্রকরকে আনাড়ী মনে করিবেন না,--যেহেতু নদী, আম্রকানন, তুষারাবৃত তরু—এ সবই সত্য।

দিবে না! আবার ওদিকে ও বাটীখানা সলিমের! সেখানে কলিমের পত্নীর প্রবেশ নিষেধ!

বলা বাহুল্য কলিমের স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র বা অলঙ্কারের অভাব নাই। বলি, অলঙ্কার কি পিতৃমাতৃহীনা অবলার একমাত্র ভগ্নীর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভুলাইতে পারে? শুনিলাম, তিনি সপত্নী-কন্টক হইতেও বিমুক্ত নহেন! এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট গৃহ কি শান্তিনিকেতন (Sweet home বলিয়া বোধ হয়? তিনি কি নিভৃতে নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন না, "আমার মত হতভাগী নিরাশ্রয়া আর নাই।"

৪। একস্থলে দুই ভ্রাতায় কলহ হইল-মনে করুন, বড় ভাইটির নাম "হাম", ছোট ভাইটির নাম "সাম"। ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া হাম স্বীয় কন্যাকে বলিলেন, "হামিদা! তুমি যতদিন আমার বাটীতে আছ, ততদিন জোবেদাকে (সামের কন্যা) পত্র লিখিতে পাইবে না।" পিতৃ-আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য্য। কিন্তু হামিদা আশৈশব যে পিতৃব্যতনয়াকে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ ভুলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।--যে দুইটি বালিকার শৈশবের ধূলাখেলার স্মৃতি উভয়ের জীবনে বিজড়িত রহিয়াছে-দূরে থাকিয়াও যাহারা পত্রসূত্রে একত্র গ্রথিতা ছিল, আজ সেই একবৃন্তের কুসুম দুইটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হাম গৃহস্বামীত্বের পরিচয় দিলেন! দুইটি অসহায়া অক্ষমা বালিকার কোমল হৃদয় দলিত ও চূর্নবিচূর্ণ করিয়া গৃহস্বামী স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন!! বলা বাহুল্য, জোবেদাও হামিদাকে পত্র লিখিতে অক্ষম! যদি তাহারা কোন প্রকারে পরস্পরকে চিঠি পাঠায়-তবে হামিদার পত্র সাম আটক (Intercept) করেন, জোবেদার পত্র হামের কবলে পড়িয়া মারা যায়!! বালিকাদ্বয়ের রুদ্ধ-অশ্রু, হৃদয়বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস যবনিকার অন্তরালেই বিলীন হয়! শুনা যায়, আইন অনুসারে ১৮ (কিম্বা ২২) বর্ষীয়া কন্যার চিঠিপত্র আটক (Intercept) করিতে পিতা অধিকারী নহেন। সে আইন কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পায় না! কবি বেশ বলিয়াছেন:

"তোমরা বসিয়া থাক ধরা প্রান্তভাগে,

শুধু ভালবাস। জান না বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার"--

তাইত; আইন আছে, থাকুক, তাহাতে হামিদা বা জোবেদার লাভ কি? ঐরূপ কত পত্র দেবর ভাসুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ (Intercepted) হয়, কে তাহার সংখ্যা করে? বিধবা ভ্রাতৃবধুটি স্বীয় ভ্রাতা ভগিনীর চিঠিপত্র লইয়া কোনমতে কালক্ষেপ করেন-যদি আশ্রয়দাতা দেবরটি বিরক্ত হন, তবে আর তাঁহার ভ্রাতা ভগ্নীর পত্র পাইবার উপায় নাই! অসহায়া অন্তঃপুরিকাদিগকে ঈশ্বর ব্যতীত আর কে সাহায্য করিবে?

৫। আমরা রমাসুন্দরীকে অনেকদিন হইতে জানি। তিনি বিধবা; সন্তান সন্ততিও নাই। তাঁহার স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি আছে, দুই চারিটি পাকা বাড়ীও আছে। তাঁহার দেবর এখন সে সকল সম্পত্তির অধীশ্বর| দেবরটি কিন্তু রমাকে একমুঠা অন্ন এবং আশ্রয়দানেও কুণ্ঠিত। আমরা বলিলাম, "ইনি হয়ত দেবর-পত্নীর সহিত কোঁদল করেন।" এ কথার উত্তরে একজন (যিনি রমাকে ১৪/১৫ বৎসর হইতে জানেন) বলিলেন, "রমা সব করিতে জানে, কেবল কোঁদল জানে না। রমা বেশ জানে, কি করিয়া পরকে আপন করিতে হয়; কেবল আপনাকে পর করিতে জানে না।"

"এতগুণ সত্ত্বেও দেবরের বাড়ী থাকিতে পান না কেন?"
"কপালের দোষ!"

হায় অসহায়া অবলা! তোমরা নিজের দোষকে "কপালের" দোষ বল বটে, কিন্তু ভুগিবার বেলা তোমরাই স্বকীয় কর্ম্মফল ভুগিতে থাক!। তোমাদের দোষ মূর্খতা, অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। রমাসুন্দরী বলিলেন, "বেঁচে থাকতে বাধ্য ব'লে বেঁচে আছি; খেতে হয় ব'লে খাই-আমাদের সেই সহমরণপ্রথাই বেশ ছিল! গবর্ণমেন্ট সহমরণ-প্রথা তুলে দিয়ে বিধবার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করেছেন!" ঈশ্বর কি রমার কথাগুলি শুনিতে পান না? তিনি কেমন দয়াময়?

৬। আমরা একটি রাজবাটী দেখিতে গিয়াছিলাম। অবশ্য রাজার অনুপস্থিতি সময় যাওয়া হইয়াছিল। তিনি উপাধিপ্রাপ্ত রাজা-রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৫,০০,০০০ টাকা।

বাড়ীখানি কবি-বর্ণিত অমরাবতীর ন্যায় মনোহর। বৈঠকখানা বিবিধ মূল্যবান সাজসজ্জায় ঝলমল করিতেছে; এদিকে সেদিকে ৫/৭ খানা রজত-আসন শূন্য হৃদয়ে রাজাকে আহ্বান করিতেছে! এক কোণ হইতে রবির একটু ক্ষীণরশ্মি একটি দর্পণে পড়িয়াছিল; তাহার প্রতিরশ্মী চারিদিকে বেল্লুরের ঝাড়ে প্রতিভাত হইয়া এক অভিনব আলোকরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে! এক কক্ষে রাজার রৌপ্যনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কখানা মশারী ও শয্যায় পরিশোভিত হইয়া প্রবাসী রাজার অপেক্ষা করিতেছে। পাঠিকা হয়ত বলিবেন, “খাটখানা রাণী ব্যবহার করেন না কেন?” তাহা হইলে সমাগত লোকেরাও লক্ষ টাকার পর্য্যঙ্কখানা দেখিতে পাইত না যে! বহির্ব্বাটী পরিদর্শন করিয়া আমরা রাণীর মহলে গেলাম।

রাণীর ঘর কয়খানাতেও টেবিল, টিপাই, চেয়ার ইত্যাদি সাজসজ্জা আছে। কিন্তু তাহার উপর ধূলার স্তর পড়িয়াছে। রাজা কোন কালে এসব কক্ষে পদার্পণ করেন বলিয়া বোধ হইল না। রাণীর শয্যাপার্শ্বে কয়েকখানা বাঙ্গালা পুস্তক এলোমেলোভাবে ছড়ান রহিয়াছে।

রাণীকে দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। কারণ বৈঠকখানা দেখিয়া আমি রাণীর যেরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, এ মূর্ত্তি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পরমা সুন্দরী (১৬/১৭ বৎসরের) বালিকা-পরিধানে সামান্য লালপেড়ে বিলাতি ধুতি; অলঙ্কার বলিতে হাতে তিন তিন গাছি বেল্লুরের চুড়ি, মাথায় রুক্ষ কেশের জটা--অনুমান পনের দিন হইতে তৈলের সহিত চুলগুলির সাক্ষাৎ হয় নাই, মুখখানি এমনই করুণ ভাবে পূর্ণ যে রাণীকে মূর্ত্তিমতী “বিষাদ” বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকের মতে চক্ষু মনের দর্পণ স্বরূপ| রাণীর নয়ন দু’টিতে কি কি হৃদয়বিদারক ভাব ছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

রাজা সর্ব্বদা বিদেশে,--বেশীর ভাগে কলিকাতায় থাকেন। সেখানে তাঁহার অপ্সরা, বিদ্যাধরীর অভাব হয় না, এখানে রাণী বেচারী চিরবিরহিণী!! বাড়ীতে দাস দাসী, ঠাকুর দেবতা, পুরোহিত ইত্যাদি সবই আছে; আনন্দ কোলাহলও যথেষ্ট আছে, কেবল রাণীর হৃদয়ে আনন্দ নাই! গৃহখানা তাঁহার নিকট কারাগার স্বরূপ বোধ হইতেছে। রাণী যেন একদল দাসীসহ নির্জ্জন কারাবাসদণ্ডভোগ করিতেছেন!! আমাদের সঙ্গী একটি মহিলা জনান্তিকে বলিলেন, "এমন চমৎকার বাড়ী, আর ঘরে এমন পরী যাঁর, তিনি কি সুখে বিদেশে থাকেন!"

রাণী বাঙ্গালা বেশ জানেন; তিনি কেবল বই পড়িয়া দুর্ব্বহ সময় কাটান। তিনি--মিতভাষিণী, বেশী কিছু বলিলেন না, কিন্তু যে দুই একটি কথা বলিলেন, তাহা অতি চমৎকার। আমাদের একটি বর্ষীয়সী সঙ্গিনী বলিলেন, "তুমি রাজার রাণী, তোমার এ বেশ কেন? এস আমি চুল বেঁধে দিই।" রাণী উত্তর দিলেন, "জানি না কি পাপে রাণী হয়েছি!" ঠিক কথা! অথচ লোকে এই রাণীর পদ কেমন বাঞ্ছনীয় বোধ করে!

অন্তঃপুরের ঐ সকল ক্ষতকে নালীঘা না বলিয়া আর কি বলিব? এ রোগের কি ঔষধ নাই? বিধবা ত সহমরণ-আকাঙ্ক্ষা করে; সধবা কি করিবে?

৭। "মহম্মদীয় আইন" অনুসারে আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হই--আমাদের বাড়ী"ও হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়,--বাড়ীর প্রকৃত কর্ত্তা স্বামী, পুত্র, জামাতা, দেবর ইত্যাদি হন। তাঁহার অভাবে বড় আমলা বা নায়েবটি বাড়ীর মালীক! গৃহকত্রীটি ঐ নায়েবের ক্রীড়াপুতুল মাত্র। নায়েব কর্ত্রীকে যাহা বুঝায়, অবোধ নিরক্ষর কর্ত্রী তাহাই বুঝেন।

গৃহকর্ত্রী মোহ্সেনা স্বীয় জামাতার সহিত কলহ করিয়া দুই এক দিনের জন্য কোন দূর সম্পর্কীয় দেবর কাসেমের বাড়ী যান। এ বাড়ীখানা মোহ্সেনার পৈতৃক সম্পত্তি-সুতরাং ইহা তাহার একান্ত "আপন" বস্তু। কর্ত্রীর একমাত্র দুহিতাও মারা গিয়াছেন; তবু জামাতাকে (দুই চারিজন দৌহিত্রী ইত্যাদি সহ) বাড়ীতে রাখিয়াছেন। এরূপ স্থলে জামাতা জামালকে শাশুড়ীর

আশ্রিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু তামাসা দেখুন, মোহ্‌সেনা গৃহে ফিরিয়া আসিলে, দ্বারবান তাঁহাকে জানাইল, এ বাড়ীতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন-"কি? আমার বাড়ীতে আমারই প্রবেশ নিষেধ? পর্দা কর, আমি (শিবিকা হইতে) নামিব।

দ্বারবান--পর্দা করিতে পারি না, মালিকের হুকুম নাই।
কর্ত্রী--কে তোর মালিক? একমাত্র মালিক ত আমি।

দ্বারবান—বে-আদবী মাফ হউক; হুজুর কি আমাকে তাঁহার পয়জার হইতে রক্ষা করিতে পারেন ? হুজুর ত পর্দায় থাকেন, আমরা জামাল মিয়াঁকেই জানি। আপনি মালিক, তাহা ত দুনিয়া জানে,--কিন্তু আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি ফিরিয়া যান। আপনি এখানে নামিলে গোলামের উপর জুলুম হবে। হুজুরেরও অপমান হওয়ার সম্ভাবনা।

যাহা হউক, হুজুর ফিরিয়া গেলেন!! তিনি কাসেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি কোন আইন নাই, যাহার দ্বারা আমার বাড়ী আমি দখল করিতে পারি?" কাসেম বলিলেন, "আছে। আপনি নালিশ করুন, আমরা সাহায্য করিব।" ওদিকে জামাল এই নালিশের বিষয় জানিতে পারিয়া কাসেমের নিকট আসিলেন। সবিনয়ে মিষ্ট ভাষায় কাসেমকে বুঝাইলেন, "আজ আপনি যদি আমার শাশুড়ীর সাহায্য করেন, তবে ত অন্তঃপুরিকাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যদি কখন আপনার এরূপ বিপদ ঘটে তবে কেহ আপনার পরিবারের স্ত্রীলোকদের সাহায্য করিবে, আপনি কি তাহা পসন্দ করিবেন? ভাবিয়া দেখুন, এরূপ হওয়া কি ভাল ? মিছামিছি শত্রুতা পাতাইবেন কেন?"

কাসেম অন্তঃপুরে আসিয়া মোহসেনাকে বুঝাইলেন যে, মামলা মোকদ্দমায় অনেক হেঙ্গাম; ওসব গোলমাল না করাই ভাল! অভাগিনী ক্রোধে, অভিমানে নীরবে দগ্ধ হইতে থাকিলেন!!

ঐরূপ আরও কত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খদিজা প্রভৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাঁহার স্বামী হাশেম দরিদ্র কিন্তু কুলীন বিদ্বান। হাশেম ছলে কৌশলে সমস্ত জমিজমা আত্মসাৎ করিয়া লইবেন; খদিজার হাতে এক পয়সা

নাই। খদিজার পৈত্রিক বাড়ীতে বসিয়াই হাশেম আর দুই তিনটা বিবাহ (?) করিয়া তাঁহাকে সতিনী জ্বালায় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এরূপ না করিলে আর ক্ষমতাশালী পুরুষের বাহাদুরী কি? ইহাতে যদি খদিজা সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করেন, তবে প্রবীণা মহিলাগণ তাঁহার হৃদয়ে স্বামীভক্তির অভাব দেখিয়া নিন্দা করেন, কেহ দুই একটা জীর্ণ পুঁথি (মসলামসায়েলের বঙ্গানুবাদ) দেখাইয়া বলেন, "স্বামী মাথা কাটিলে 'আহ্' বলিতে নাই!" কেহ সুরযোগে আবৃত্তি করিলেন :

"নারীর মোর্সেদ[২৮] স্বামী সের্তাজ[২৯] জানিবেন
মোর্সেদের সম নারী পতিকে ভজিবে!"

যাহা হউক খদিজার দু:খে সহানুভূতি করিবে, এমন লোকটি পর্য্যন্ত নাই! ইহাকে নরকযন্ত্রণা ভিন্ন আর কি বলিব? কোন মৌলভী বক্তৃতা (ওয়াজ) করিতে যাইয়া বলিয়োছেন, "স্ত্রীলোকে বেশী গুণা (দোষ) করে; হযরত মেয়ারাজ গিয়া দেখিয়াছেন নরকে বেশীর ভাগে স্ত্রীলোক শাস্তি পাইতেছে!" আমরা কিন্তু এই পৃথিবীতেই দেখিতেছি-কুলকামিনীরা অসহ্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন!

৮। পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কি কি জঘন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে? কোন ভ্রাতা তাহা মুখ ফুটিয়া বলেন না–বলিলে অবলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে যে![৩০] সুতরাং সে শোচনীয় কথা আমাদিগকেই বলিতে হইতেছে। কোন স্থলে আফিংখোর, গাঁজাখোর, নিরক্ষর, চিররোগী বৃদ্ধ--যে মোকদ্দমা করিয়া জমিদারীর অংশ বাহির করিতে অক্ষম এইরূপ লোককে কন্যাদান করা হয়।

---

[২৮] মোর্সেদ--গুরু

[২৯] সের্তাজ–(সের--তাজ) মাথার মুকুট, অর্থাৎ মুকুটতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ।

[৩০] স্ত্রীলোকের দুঃখকাহিনীপূর্ণ একিট প্রবন্ধ একান উর্দ্দু সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্তে এদোয়া হইয়াছিলো। সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই–লিখিলেন যে, এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলে সাধারণ পুরুষসমাজ চটিবেন! সুখের বিষয়, বাঙ্গালা কাগজগুলির যথেষ্ট সৎসাহস আছে, তাই রক্ষা! নচেৎ আমাদের দুঃখের কান্না কাঁদিবার উপায়ও থাকিত না!

অথবা ভগ্নীর দ্বারা বিবাহের পুর্ব্বেই লা-দাবী লিখাইয়া লওয়া হয় কিম্বা ভগ্নীদিগকে চিরকুমারী রাখা হয়; এবং ভ্রাতৃবধু ননদদিগকে দাসীর মত ভাবেন! আর যদি কোন পরিবারে পুত্র মোটেই না থাকে, কেবল ডজন, অর্দ্ধ ডজন কন্যাই থাকে,--তবে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ভাগ্যবান স্বামীটি অবশিষ্ট শ্যালিকা কয়টিকে চিরকুমারী রাখিতে চেষ্টা করেন! ইহাই সমাজের নালীঘা!! হায় পিতা মোহাম্মদ (দঃ)! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারিণী করয়িাছে, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্ব্বনাশ করতেছে!! আহা "মহম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি-রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নহে।

৯। নববিধবা সৌদামিনী দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ ভ্রাতার আলয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। ৯/১০ মাস পরে তাঁহার (১৫ ও ১২ বৎসরের) পুত্র দুইটি দশ দিনের ভিতর মারা যায়। সৌদামিনীর নিকট ১০,০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল।

যে সময় বিধবা সৌদামিনী পুত্রশোকে পাগলপ্রায় ছিলেন, সেই সুযোগে (অর্থাৎ বালকদ্বয়ের মৃত্যুর একমাস পরেই) ভ্রাতা নগেন্দ্র ঐ টাকাগুলি তাঁহারই নামে গচ্ছিত রাখিতে ভগ্নীকে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের নামে টাকা জমা থাকলে গোলমাল হতে পারে। আমি ত আর তোমার পর নই।" ভগ্নীর মাথা ঠিক ছিল না, নগেন্দ্র যাহা লিখাইলেন তিনি তাহাই লিখিলেন। ভাবিলেন, "অমন চাঁদ যদি গিয়াছে, তবে আর পোড়ার টাকা থেকে কি হবে? প্রতিভার বিয়ে ত নগেন্দ্র দিবেই। আমি এখন ম'লে বাঁচি।" নগেন্দ্র ক্রমে দুই তিনটা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু প্রতিভার বিবাহের জন্য মোটেই ভাবেন না। তাহার বয়স ১২ বৎসর হইলে সৌদামিনী তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি যত তাড়া করেন, নগেন্দ্র ততই বলেন, "বর পাওয়া যায় না!"

প্রতিভা ১৫ বৎসরের হইল–বিবাহ হইল না। ১০,০০০ টাকা দিয়া বর পাওয়া যায় না, একথা কি পাঠিকা বিশ্বাস করেন? প্রতিবেশিনীরা নিন্দা করে,

অভিশাপ দেয়, "ছি ছি কেমন মামা!" বলে, তাহাতে নগেন্দ্রের কি ক্ষতি হয়! পল্লীগ্রামের নিন্দা অপবাদ চতুপার্শ্বস্থিত শস্যক্ষেত্রেই বিলীন হয়। প্রকাণ্ড পাটক্ষেত্রে বড় বড় শুকর লুক্কায়িত থাকিতে পারে, আর ঐ নিন্দাটুকু লুকাইতে পারিবে না?

এখন সৌদামিনী দেখিলেন তাঁহার স্বামীর কষ্টে উপার্জ্জিত টাকা দ্বারা নগেন্দ্রের অবস্থা ভাল হইল, কন্যাদের বিবাহ হইল--কেবল তাঁহারই একমাত্র প্রতিভা কুমারী রহিল। ভগ্নী মানকুমারী বলিয়াছেন:

"কাঁদ তোরা অভাগিনী। আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি, ক' ফোঁটা নয়ন বারি
ভগিনী! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব;
যখন দেখিব চেয়ে অনূঢ়া "প্রাচীনা মেয়ে"
কপালে যোটেনি বিয়ে-তখনি কাঁদিব,
যখন দেখিব বালা সহিছে সতিনি জ্বালা
তখনি নয়ন জলে বুক ভাসাইব;
সধবা বিধবা প্রায় পরান্ন মাগিয়া খায়--
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব,
এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ দিতে পারি বলিদান--
তোদেরি কল্যাণে বোন্! কিন্তু কি করিব?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।"

আমি কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইয়া কাঁদিবার সুরে সুর মিলাইতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি কেবল "কাঁদিয়া মরিতে" ব্যয় করিলেন! বাস! ঐরূপ বিজনে অশ্রু ঢালিয়া ঢালিয়াই ত আমরা এমন অবলা হইয়া পড়িয়াছি।

আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীগণ হয়ত মনে করিবেন যে আমি কেবল ভ্রাতৃবৃন্দকে নিরাকারে পিশাচরূপে অঙ্কিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি। তাহা নয়। আমি ত কোথাও ভ্রাতাদের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার করি

নাই--কাহাকেও পাপিষ্ঠ, পিশাচ, নিষ্ঠুর বলিয়াছি কি ? কেবল রমণীহৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে, "বলিতে আপন দু:খ পরনিন্দা হয়", এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে--ভগ্নীর দু:খ বর্ণনা করিতে ভ্রাতৃনিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।

সুখের বিষয় আমাদের অনেক ভ্রাতা এরূপ আছেন, যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে যথেষ্ট শান্তিতে গৃহসুখে রাখেন। কিন্তু দু:খের সহিত আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে অনেক ভ্রাতা আপন আপন বাটীতে অন্যায় স্বামীত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।

এখন বোধ হয় সুযোগ্য ভ্রাতৃগণ বুজিবেন যে, "এত বড় সংসারে আমরা নিরাশ্রয়া" বলিয়া আমি ভুল করি নাই-ঐ কথার প্রতিবর্ণ সত্য। আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, অভিভাবকের বাটীতে থাকি। প্রভুদের বাটী যে আমাদিগকে সর্ব্বদাই রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে রক্ষা করে, তাহা নহে। তবু:

যখন আমাদের চালের উপর খড় থাকে না, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটীরের শেষ চালখানা ঝঞ্জানিলে উড়িয়া যায়,--টুপ-টাপ বৃষ্টিধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজিতে থাকে,--চপলা-চমকে নয়নে ধাঁধা লাগে,-বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে, এবং আমাদের বুক কাঁপে,--প্রতি মুহূর্তে ভাবি, বুঝি বজ্রপাতে মারা যাই-তখনও আমরা অভিভাবকের বাটীতেই থাকি।

অথবা গৃহস্তের বৌ-ঝী রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি; আর যখন চৈত্র মাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটীতে দুষ্টলোক কর্ত্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়,--সব জিনিষপত্রসহ ঘরগুলি দাউদাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে,--আমরা একবসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনমতে দৌড়াইয়া গিয়া দূরস্থিত একটা কুলগাছতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি,--তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি!! (জানি না, কবরের ভিতরও অভিভাবকের বাটীতে থাকা হয় কি না!!)

ইংরাজিতে Home বলিলে যাহা বুঝায়, "গৃহ" শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই। উপরে যে রাণী, রমা, হামিদা, জোবেদা প্রভৃতির অবস্থা বলা হইয়াছে, তাঁহারা কি গৃহসুখ ভোগ করিতেছেন? শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তিনিকেতন যাহা, তাহাই গৃহ। বিধবা হইলে স্বামীগৃহ একরূপ বাসের অযোগ্য হয়; হতভাগিনী তখন পিতা, ভ্রাতার শরণাপন্ন হয় কিন্তু তাহাতে তাহার যে দশা হয়, সৌদামিনী-চিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। একটা হিন্দি প্রবাদ আছে।

"ঘর কি জ্বলি বনমেঁ গেয়ী-বনমেঁ লাগি আগ
বন বেচারা কেয়া করে, -কর্‌মমেঁ লাগি আগ!"

অর্থাৎ "গৃহে দগ্ধ হইয়া বনে গেলাম, বনে লাগিল আগুন; বন বেচারা কি করিবে, (আমার) কপালেই লাগিয়াছে আগুন!"

তাই বলি, গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটীর নাই। প্রাণি-জগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে--নাই কেবল আমাদের।[৩১]

---

[৩১] আমাদের যে সকল ভগ্নী গৃহসুখভোগ করেন, এ সন্দর্ভটি তাঁহাদের জন্য লিখা হয় নাই–ইহা গৃহহীনাদের জন্য।


Read Online
pdf